KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নর্থ রোড, যাদবপুর, কল-৩২
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
Title : অলিন্দ (ALINDA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : (গ্রীষ্ম সংকলন) (শরৎ সংকলন) (শীত সংকলন) (শীত সংকলন)	Year of Publication : ১৩৯৭ ১৩৯৭ ১৩৯৮ ১৪০০ Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শরৎ সংকলন

১৩৯৭

আলিন্দ

সম্পাদক

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

অলিন্দ

ষাণ্মাসিক সাহিত্য-সংকলন

শরৎ ১৩৯৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

অমিয় চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীলকুমার নন্দী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, মানস রায়চৌধুরী, শান্তিকুমার ঘোষ, মণীন্দ্র গুপ্ত, অরুণকুমার ঘোষ, সামসুল হক, মানিক চক্রবর্তী, ভাস্কর চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, কালীকৃষ্ণ গুহ, মৃণাল দত্ত, সুব্রত চক্রবর্তী, রাণা চট্টোপাধ্যায়, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অভী সেনগুপ্ত, দেবী রায়, আশিস সান্যাল, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ, সত্যবতী গিরি, সুব্রত রুদ্র, তুলসী মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্র মজুমদার, উত্তম দাশ, কৌশিক গুহ, বিষ্ণু সামন্ত, শিখা সামন্ত, শম্ভু বসু, নির্মল বসাক, কৃষ্ণা বসু, সুরজিৎ ঘোষ, অজয় নাগ, সুজিত সরকার, সুবোধ সরকার, নির্মল হালদার, ব্রত চক্রবর্তী, অনুরাধা মহাপাত্র, পার্থপ্রিয় বসু, প্রমোদ বসু, শান্ত রায়, সুদীপ বসু, গৌরীশঙ্কর দে, বাপী সমাদ্দার, সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক রায়, অরণি বসু, সৈয়দ হাসমত জালাল, জহর সেন মজুমদার, গৌতম ঘোষদস্তিদার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ কোঙার, দীপক লাহিড়ী, চিত্রা লাহিড়ী, কেদার ভাদুড়ী, ঊর্মিলা চক্রবর্তী, শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়, শুকতারা রায়, খোকন বসু, শ্যামলজিৎ সাহা, শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়, নৃসিংহ মুরারি দে, জয়তী রায়, অহনা বিশ্বাস, অরুণাংশু ভট্টাচার্য কৃত্তিবাস রায়, রাহুল রায়, অমলেন্দু বিশ্বাস, তাপস রায়, ধীমান চক্রবর্তী, অভীক মজুমদার, কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম হাজরা, ভাস্বতী রায়চৌধুরী, কাজল চক্রবর্তী, কল্যাণ মিত্র, অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবায়ন ঘোষ, নাগ সেন, পৌলমী সেনগুপ্ত, মৌসুমী চক্রবর্তী, শবরী ঘোষ,

দিব্য মুখোপাধ্যায় এবং প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সম্পাদক : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : মেরিঅ্যান দাশগুপ্ত

প্রকাশক : ডক্টর পার্থ দাশগুপ্ত

মুদ্রক : স্বর্ণাক্ষর

৩১৯/২ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া-১

দাম : পাঁচ টাকা

কবিতায় আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রচার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

অনেকেই কবিতা লেখেন আজকাল এদেশে, অন্যান্য দেশেও কবি বা লেখকের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু মাঝেমাঝে প্রশ্ন ক'রতে ইচ্ছে করে এই ব্যাপক কবিতা রচনার পেছনে সত্যিকারের উদ্দেশ্য কি? আমি সবার কথা ভেবেই এই কথা লিখছি, তবে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য এদেশের তরুণ কবিদের ক্ষেত্রে যাঁরা পাতার পর পাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে দিচ্ছেন লিটল ম্যাগাজিনের কলেবর। সঙ্গে সঙ্গে ব'লে নিই, অনেক তরুণ কবিই ভালো কবিতা লিখছেন আজকাল—অন্যান্য দেশের মতো এদেশেও ভালো মন্দ মাঝারি কবিতা নিত্যদিন নির্মিত হচ্ছে, কিন্তু আমার প্রশ্নের ক্ষেত্র অন্যত্র। একজন তরুণ কবি কি শুধু আত্মপ্রকাশের তাগিদেই কবিতা লেখেন? যদি লিখে থাকেন, তাহ'লে তা সাধুবাদের যোগ্য। প্রথম যৌবনের উন্মীলনে আবেগের তাড়নায়, অনুভূতির চঞ্চলতায়, কিছু একটা ব'লে ফেলবার লিখে ফেলবার ইচ্ছে হ'তেই পারে কারো—সে বাঙালি যুবকই হোক বা বেলজিয়মের তরুণীই হোক। কিন্তু যদি একটি কি দুটি বা তিনটি লিটল ম্যাগাজিন পড়ে কবিতা লেখার একটা সহজ ফর্মুলা কেউ আবিষ্কার করে বসেন, একজন যা লিখছেন তাকেই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরেকজন লিখে ফেলে দাবী করেন তাঁর রচনাটিও কবিতা, তাহ'লে ঈষৎ সংকটের সম্মুখীন হ'তে হয়। বিশেষত যখন দেখি, সেই কবিতা বা পদ্যটি রচনা করবার পরেই তাকে অবিলম্বে মুদ্রিত দেখতে চান কোনো তরুণ কবি। এই পত্রিকাঅধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে রচনা প্রকাশ করা আদৌ কঠিন কাজ নয়, কিন্তু তার পরে? "What then, says Plato's ghost, what then ?" তখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই কবিরা আত্মপ্রকাশের তাগিদে যতোটা না লিখছেন তার চেয়ে বেশি লিখছেন আত্মপ্রচারের স্বার্থে। কিংবা, দুটি বৃত্তিই হয়তো কাজ করছে একসঙ্গে যার কোনোটিই এক হিসেবে নিন্দনীয় নয়। নিন্দনীয় শুধু এটুকুই যে ছোটো ছোটো বৃত্তে উপবৃত্তে নাম ক'রবার জন্যে, বা কিছু পরে বৃত্ত-অতিক্রামী গণ-মাধ্যমের সাহায্যে পরিচিত হবার লোভে অনেক তরুণ কবিই বিভ্রান্ত থেকে বিভ্রান্ততর হ'য়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা ভুলে যান পুরো পরি-প্রেক্ষিতের সঙ্গে তাঁদের লেখাজোখার সম্পর্ক, প্রাচীন ও ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে তাঁদের পাঠ নেবার দায়িত্ব, এবং সর্বোপরি পরিহার করেন যে বর্ণটি তার নাম সহিষ্ণুতা। বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি এই অসহিষ্ণুতার সধূম আগুন চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে—একজন আরেকজনকে মানতে চান না, একটি গোষ্ঠী অস্বীকার করেন আরেকটি গোষ্ঠীকে, এবং যে 'রুচির সমগ্রতা'-র কথা শঙ্খ ঘোষ উল্লেখ করেছেন, সেই সমগ্রতা কোথাও তেমন চোখে পড়ে না। আরেকটি জিনিসও লক্ষ্য করছি আমি—

বাঙালিপনার নামে একধরণের গ্রামীণতা আগ্রাসী শ্যাওলার মতো ঢেকে ফেলছে আমাদের দৃশ্যপট, এবং যাঁদের আমরা জনপ্রিয় লেখক বা কবি বলি তাঁদের অনেকের মধ্যেই অচেতন বা অর্ধ-সচেতনভাবে এই বিষয়টি লক্ষ্য ক'রে পুলকিত হচ্ছেন বাঙালি পাঠক, বাঙালি প্রকাশক, বাঙালি সাহিত্যক্রেতা। অলোকরঞ্জন কবিতায় লিখেছিলেন "বড়ো গ্রাম্য গ্রাম"। বাইরের উপচীয়মান সংস্কৃতিপ্রবাহ সত্ত্বেও আমার মনে হয়, এই কলকাতা ভূখণ্ডে গ্রামীণতা অনেকটা জায়গা জুড়ে বসেছে, এবং তা বিক্রিও হচ্ছে চড়া দরে। তিরিশের দশকের বাংলা কবিতায় এই ব্যাপারটি একেবারেই ছিলো না, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকেও তা একেবারে মিলিয়ে যায় নি, কিন্তু তার পর থেকেই ভালো হোক মন্দ হোক এই উচ্চকিত গ্রাম্যতার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমরা। তাকে কখনো আউলবাউল লাবণির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে, কখনো বা সমাজসচেতনতার সঙ্গে। কিন্তু কবিতাকেই শুধু সমাজসচেতন হতে হবে তাই নয় (সব কবিতাই এক হিসেবে সমাজ-সচেতন), সমাজকেও হ'তে হবে কবিতাসচেতন।

'অলিন্দে'-র এই সংখ্যায় শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ ষাটদশকের কবিতা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সব প্রবন্ধের মতো, বিশেষত এই ধরণের সব প্রবন্ধের মতো শ্রীযুক্ত ঘোষের প্রবন্ধটিও শুধু আলোচিত হবে না বিতর্কিতও হবে। তাঁর মতামতের জন্যে—লেখা বাহুল্য—সম্পাদক দায়ী নন। আমার প্রিয় কবি সুব্রত চক্রবর্তীর একটি অপ্রকাশিত কবিতা ছেপেছি এই সংখ্যায়, যা তাঁর আপৎকালে প্রকাশিত হয় নি। কবি শ্রীমাণিক চক্রবর্তী অত্যন্ত অসুস্থ; তাঁর দুটি কবিতা আছে এই সংখ্যায়, আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। স্থানাভাবে, অনেকের মনোনীত কবিতাও এ-সংখ্যায় দেয়া গেলো না, তার জন্যে সম্পাদক ক্ষমাপ্রার্থী। অনেক উজ্জ্বল তরুণ মুখ আবিষ্কার করেছে "অলিন্দ"—এ-সংখ্যাতেও দুজনের কবিতা প্রকাশিত হ'লো, যাঁদের কবিতা আগে কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

১ আশ্বিন ১৩৯৭ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয়-দপ্তর : ৩ নর্থ রোড, কলকাতা-৭০০০৩২

শঙ্খ ঘোষ

আবোল তাবোল

আমি যতক্ষণ আছি কারো কথা শুনতে চাই না আর
মাথায় সোহম্ মন্ত্র গেঁথে নিয়ে বসেছি কোটরে।
আমি আছি গিন্নি আছে, তাছাড়া আমার ছয় ছেলে
যথেষ্ট লয়েক, যদি আমাদের মোলায়েম ডাকে
কাছে না আসতে পারো লাজভয় সব ছেড়ে, তবে
কী-রকম হতে পারে হালহকিকৎ সে তো জানো!
হাতে যে মুগুর দেখছ এর গায়ে তেল মাখা আছে
মারলে লাগে না বেশি। মরে যেতে পারো, সেটা ঠিক,
কিন্তু সে তো স্বাভাবিক, মারবারই জন্যে মারে লোকে।
শুধু এই? এরই জন্যে মিথ্যে ও-রকম ভয় পেলে
আমার কাছে না এলে আমার কথা না শুনলে আজ
আমি তো বুঝি না তুমি কীভাবে-বা হবে জনগণ!

জ্বালানি

লাইনেই ছিলাম বাবা, লহমার জন্য ছিটকে গিয়ে
খুঁজেই পাই না আর নিজেকে কী মুশকিলে পড়েছি!
এটা তো আমারই টিন? আমার না? এটাই আপনার?
সবই দেখি একাকার! আমি তবে কোথায় রয়েছি!
এ কী হচ্ছে? সরে যান না! সরে সরে—আমরা কি আলাদা?
দেখছেন তো সবকটা এই একসঙ্গে জাপটানো দড়িবাঁধা।
থামুন না। তুমি কে হে? আমি? হেই। হোই হেই হাট্
প্রতিবাদ? না না বাপু—কিছুই করছি না প্রতিবাদ।
কোনোমতে ফিরে যাব ফাঁকা টিন বাজিয়ে সহজে—
আগুনই কোথাও নেই—কী হবে-বা জ্বালানির খোঁজে!

শিক্ষাষ্টক

ভূতেরা এসে বাজালে মন্দিরা
ধুতুরা-থুতু ছিটিয়ে দেব খুব

ফ্যাসিবাদীরা বানালে পত্রিকা
গ্রাহক আমি হতে যাব না তার

সেতুরা যদি নদীকে ঘৃণা করে
তাদের নাক আকাশে ঘষে দেব।

যমদূতেরা আমাকে একা যদি
অমৃত দেয়, উল্টে দেব কলস

প্রজাপতিরা গর্ভবতী হলে
দেবদূতেরা জন্ম নিক এসে

মৃত্যু যদি গোলাপ ভালোবাসে
গোলাপ আমি ছোঁবো না কোনোদিন

দেবদূতেরা জন্ম নিয়ে যদি
সেলামি চায়, সে-ঘর ভেঙে দেব

কিনারা ছেড়ে বিপুল কালীদহ
কলমা পড়ি অকূল বিস্ময়ে

অদ্ভুত বিভ্রমে আছি

অদ্ভুত বিভ্রমে আছি, চেনা দায়
পরিচিত মুখের আঙ্গিক—
যার যত কাছে আসি, তার মুখ তত হয় ভুল।

এমন কেন-যে হচ্ছে, অথচ ডাক্তার
বারবার বলে যাচ্ছে :
আপাতত চোখে নেই তেমন অসুখ।

চোখ যদি স্বাভাবিক, তাহলে কী! হয়তো এখন
সহজাত মুখরেখা
দিনদিন কুরে খায় রীতিহীন সমাজের গভীর অসুখ।

যেহেতু ভাসিয়ে-তোলা রক্তের প্রতিভা, এই
উষ্ণ নিবিড়তা
পড়ে আসছে, অনুভবে মেলানো কঠিন—

বোঝা-না-বোঝার মধ্যে তিরতির বহে চলে
তরল আগুন ;
নাড়তে-নাড়তে গলে যাই, গলে যাচ্ছে চেনা-চেনা মুখ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ময়দার মানুষ

সারাক্ষণ ঘরে থাকো,
গ্রন্থে মুখ গুঁজে থাকো
চোখ চশমায়,
শীততাপজব্দ-ঘরে বহুদিন কাটাতে কাটাতে
তোমার শরীর থেকে
পচা আপেলের ভ্যাপসা গন্ধ ছড়ায়,
পেকে যায় বিবেচনা চুল,
তোমার ভেতর থেকে কাম হিংসা রাগ ভালোবাসা
কখন কর্পূর হয়ে উবে গিয়ে
আরামকেদারা ভরে তোমাকে বিছিয়ে গেছে
থলথলে ময়দার মানুষ!
আঁচল উড়িয়ে ঐ ভয়ংকর স্তনবতী যে-সব যুবতী
তোমাকে 'আংকল' ডেকে থুৎনিতে ঠোনা মেরে
উড়ে গেল একঝাঁক হাসি
তারা তো রৌদ্রেরই লাল স্তব,
তোমার শরীরে শুধু অবাধে সাম্রাজ্য করে
বিবেচনা অমূলক কফ…

তারাপদ রায়

কালোজিরে

অনেকদিন পরে আজ ছোটবাবু বাজারে গিয়েছেন,
অনেকদিন মানে কতদিন,
ছোটবাবু কিছু মনে করতে পারেন না।
কিন্তু তাঁর মনে আছে সেবার
চারটে আনারস কিনেছিলেন,
কিছু তরকারি, দু রকম মাছ;
বোধহয় মাংসও নিয়েছিলেন অনেকটা।
তবে তাঁর সবচেয়ে বেশি মনে আছে
সেদিন কালোজিরে কেনেননি,
কালোজিরে কিনতে ভুলে গিয়েছিলেন,
এবং সেই জন্যে সেজবৌদি খুব রাগারাগি করেছিলেন।

আজ অনেকদিন পরে ছোটবাবু বাজারে এসেছেন,
বাজারে আসার আগে
বারবার সেজবৌদিকে জিজ্ঞাসা করেছেন,
'কালোজিরে লাগবে কিনা?'
সেজবৌদি অবাক হয়ে রান্নাঘর থেকে বলেছেন,
'কালোজিরে? কালোজিরে দিয়ে কি হবে?
কালোজিরের কথা আসছে কেন?'

কেন আসছে কে জানে!
আজ অনেকদিন পরে ছোটবাবু বাজারে এসেছেন,
তাঁর বারবার মনে হচ্ছে কালোজিরের কথা।

স্মৃতি-বিস্মৃতির ছন্ন পংক্তিমালা

১.
মির্জার গভীর স্বর ফিরে আসে ভোরের বাগানে!
যে ডানায় জানা অজানায় রৌদ্র নড়ে
শুধু মির্জাই দেখে বুঝতে পারে
পাখি নিজে তা বোঝেনা
ছন্দ নয় ক্ষুধা তাকে রোজ ভোরে আকাশে পাঠায়!

২.
পর্যবসিত ফলের ভিতরে রস
রসের ভিতর—কে, কে, ও কে গো!
শোষণে সমস্ত রস শুষে নিচ্ছ তুমি
তবু এক-ইহকালে ঠোঁট-পেরুনো রসাভাস টেরই পেলেনা!

৩.
যে গানের মধ্যে তুমি আজীবন বসে আছ
অনেকেই সেই গানের প্রাণের কাছে এসেছিল
তুমি টেরই পাওনি,
এখনতো তোমাকে নানান সুরে গেয়ে যায়
জ্যোৎস্নার বাতাস!
তুমি সুর বা সুরদাস—কাউকেই চিনলেনা!

৪.
টালমাটাল নৈশ পথে দৃশ্য মুছে গেলে
নিজের দরজা খুঁজি! খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে
হঠাৎ যখন পেয়ে যাই, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি—ভাবি
এতক্ষণ সত্যিই কি বাইরে ছিলাম!
নাকি দরজাই পৃথিবীবাহির কোনো অলীক প্রক্রিয়া!
শব্দদাসানুদাস আমি অক্ষরের ভয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকি,
দরজাও দাঁড়িয়ে থাকে নিজের খেয়ালে।

৫.
আকাশের নীল-ছিনিয়ে অন্যায় করেছে সাগর
সে তাই ক্ষমাপ্রার্থনার মতো বারবার নীলকে নাড়ায়, ঢেউ করে,
নীল ছোঁবে বলে কবি কেবলি ঊর্ধ্বগ ওঠে
নীহারিকাপুঞ্জকে এড়িয়ে নক্ষত্র পেছনে রেখে···উঠে, উঠে, উঠে
—তবু সেতো নীলিমা পারে না! ফিরে
সাগরের কৃতাঞ্জলি জল তুলে দ্যাখে
হায়! সেই তর্পণসলিলও নীল নয়
নীলের মতন!

৬.
ফুটপাতে আছো? থাকো,
পাশে থাকুক স্বর্গের ঠিকানা জানা কৃশাঙ্গ কুকুর
শিয়রে সুলভ দেবদারু—ঐখানে তাকালে
দেখা যাবে মৃদু মৃদু নড়ে উঠছে নিদ্রাদ্বিধার নিশীথিনী!
মানুষ বাতাস বলে তাকে ডাকে,
অথচ ভিখারীশরীরের নিচের পাথর-ঘুমে স্বপ্ন বেড়াতে আসে
হয়তো ভাতের একথালা স্বপ্ন, হয়তো হয়তো···না
অক্ষর লেখালেও
গাছ বা বাতাস স্বপ্ন দেখতে জানেনা!

৭.
মূল বেহালায় কোনো সুর নেই
তবু এক সনির্বন্ধ একতারার তার
বাউলের হাত থেকে ছুটে আসে!
যেন তাকে পাশে বসালেই
বোঝা যাবে এক কেন একা হয়েছিল, অন্ধকার
একাধিক প্রবল নক্ষত্র-দুঃখ লিখে
অবশেষে হয়েছিল চন্দ্রাহত দূর
মূল বেহালায় আজ সবই পরাজিত সুর!

ত্রিশঙ্কু

সিঁড়ি নেমে যায় দুঃখে নিচের দিকে
সিঁড়ি উঠে যায় আনন্দভরা রৌদ্রের আহ্নিকে
এই ওঠানামা বিগত পঁচিশ বছর ধরেই দেখছ
নাকি দেখছ না আড়চোখে শুধু অসহায় দিনটিকে
পরিমাপ করে ঝামরে উঠছো কোথায় তোমার শয্যা
সিঁড়ি নেমে যায় খোঁপা খুলে যায় নেই কোন লাজলজ্জা।

'নামছি নামছি' বলতেই যেন দুহাত দিয়েছ মেলে
সুখ নেই কোন সম্পদ নেই বদলে তুমি কি পেলে
জীবনের সেই গূঢ় সন্দেশ, এখন উড়ছে ঝড়ে
আমাদের দিন ফুরিয়ে কোথায় নবদম্পতী খড়ে
বিছানা বিছায়, সে-ও এক সুখ দুঃখের হাত ধরে
এ-পাড়া ও-পাড়া জলাজঙ্গলে কিছুই না ভেবে ঘোরে।

সিঁড়ি উঠে যায় শুদ্ধতা চেয়ে উজ্জ্বল মহাকাশে
সিঁড়ি নেমে যায় নামব বলেই পায়ের তলার ঘাসে
যা কিছু দেখছ সেই প্রেক্ষণে তোমার এখন মুক্তি
কে কোথায় খোঁজে চোখের ভাষাই রুদ্ধ প্রবেশ্য উক্তি
এসো না যেয়ো না ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকো
কাঁপছে পৃথিবী দেখছ কি ভেবে কিভাবে পেরোবে সাঁকো!

বাণীহারা

একদিকে উঠছে পাহাড়,
অন্য ধারে উথলে সমুদ্র;
কিনারায় পা রেখে
তাকে বললাম : 'এসো না,
বদলে নিই ভূমিকা আমাদের…
গভীরতা লাগুক আমার তানে;
সৌধ-স্তম্ভ-সাঁকো ছাড়িয়ে তুমি তুলে দাও মাথা।'
বললো সে, 'জীবনশৈলী নেব যে পালটে,
আমাদের এত ভালোবাসা-টান বহু কাল ধ'রে,
বিযুক্তির ব্যথা যদি বাজে!
কেন আমি ধনে-জনে রয়েছি জড়ায়ে।'
আর সেই দূলতে-থাকা গাঢ় নীল সিন্ধুজল মসীকৃষ্ণ হ'য়ে ক্রমে
ভেঙে পড়ে ফেনময় সৈকত-রেখায়।
আমাদের মুখ থেকে খসে-পড়া অস্ফুট শব্দবন্ধগুলি
মিশে যায় হাওয়ার উল্লাসে।
তখনো মেঘের শীর্ষে সোনালি-কমলা রশ্মি।

তবু বলি তার মুখে চোখ থুয়ে,
'শুরুতে যে-অভিপ্রায়, বিলোবার জন্য প্রেম
কী ক'রে শুকালো তা—ব'য়ে ফিরি শূন্যগর্ভ ভগ্নাংশ জীবন।
এই শান্তি ভয়াবহ…এক ভারী নৈঃশব্দ্য
আমাদের বধির করে।'
ততক্ষণে সঙ্গিনীর মুখ-রেখা গেছে মিলিয়ে
তরল আঁধারে। যেন প্রলয়ের প্রান্তে
কণ্ঠস্বর বাজে তার :
'দ্যাখো, শূন্যতল থেকে জাগে
একে-একে নীল তারা—ভাঙা কুঁড়ের মাথার উপরে
ম্যাজিকলণ্ঠন! উষর প্রান্তর আজ ফসলের ঢেউয়ে
তোলপাড়। জননী এসেছে নিজে পরমান্ন দেবে ব'লে
শিশুদের মুখে।'

তিন ভুবনের জীবপ্রাণী মাথা নুয়ে থাকে
সময়ের তীরে। আমরাও বাণীহারা।

আরো সুন্দর

তারায় ভরা রাতের আকাশ
নীচে বর্ষণ ক'রে চলেছে মেঘ
কঞ্জায় আরো সুন্দর হ'য়ে ওঠে
সগর্বে দুলতে-থাকা
পাইন গাছের সারি

মেঘ-গর্জন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত পাহাড়ে-পর্বতে
নির্মল ফুটে আছে নীল শুভ্র রাঙা জ্যোতিষ্কগুলি
স্বচ্ছ বৃষ্টি-জালের ঊর্ধ্বে

কে আমাকে চিনিয়ে দেবে সৌভাগ্যের তারাটিকে
যার রশ্মি কত আলোক-বর্ষ পেরিয়ে
পৌঁছচ্ছে আমার হৃদয়ে

মাথায় তবু কলস স্থির

মাথায় কলস
কলসে জ্বলে আগুন
ঠিকঠাক ভারসাম্য রেখে
প্রলয় নাচে অপ্সরা কি মৃন্ময়ী
উদ্ধত লাল উড়ছে বসন
ভ্রষ্ট কুসুম কুড়োতে চাই
হারায় কোন্ ঢেউয়ের বাঁকে
কে রাজপুত পেতে' হৃদয়
যাতে চরণ ফেলে লীলার ভরে
অস্তিত্ব জুড়ে ভূকম্পন
মাথায় তবু কলস স্থির
কলসই ফের অগ্নিগিরি
মরুমায়ার মর্ম ফুঁড়ে
মূর্তিমতী একক শিখা

ইঁদুর বা মাকড়সা

টুকরো টুকরো মরা মাকড়সাকে পিঁপড়েরা
বয়ে নিয়ে চলেছে—
তাদের নিঃশব্দ হরিধ্বনি, ছয় পায়ে চলেছে ছায়া হয়ে।
মুগ্ধ প্রেমিক, সেও দিবসে নিশায়, তার প্রেমিকাকে
টুকরো টুকরো করে বয়ে নিয়ে চলেছিল পৃথিবীর শেষ কিনারায়।
তার বিজাতীয় ভাষার হরিধ্বনি
ঘোড়ার মুখের মদ্যপ ফেনার মতো উড়ে যাচ্ছিল বাতাসে।
গেরস্তেরা ঘুমোবার পর রান্নাঘর থেকে টলতে টলতে
বেরিয়ে এল ইঁদুর। তাকে বিষ দেওয়া হয়েছে।
এখন বিষই বয়ে নিয়ে যাবে তাকে।
বিষই তার ব্যথাবধির কানে তারকব্রহ্ম নাম শোনাবে।

মৃত ইঁদুর আর আমি ছাতে উঠে দেখি:
জ্যোৎস্নারাত্রের বেগবান গহীন গম্ভীর নদীতে বান ডেকে
চরাচর ভেসে গেছে—
সেই আরকে ডুবে একতলা দোতলা সতেরোতলা বাড়ি,
ফুটপাত, ট্রামডিপো গলিতাঙ্গ হয়ে ক্রমশ অন্তর্ধান করছে।
ইঁদুর এইমাত্র জন্মমৃত্যু ভেদ করে এসেছে—
'ঐ দ্যাখো, সমস্ত বেদ আর প্রলাপ একই নর্দমা দিয়ে ভেসে চলেছে—'
ইঁদুর বললে, 'আমি জানি না আমার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে।'
তারপরই সে মাকড়সার মতো আট-পা হল, পিঁপড়ের মতো
ছয়-পা হল, মানুষের মতো দুই-পা হল,
শেষে ডিমের মতো গোল হয়ে কাঁপতে লাগল, অধৈর্য, অস্থির।

সামসুল হক

আরো গাঢ় লাল

বৃষ্টির অলৌকিক শব্দ ঘুম ভাঙালো
জানলার এপারে থেকেও এতো কাঁপছি কেন
আজ আষাঢ়ের প্রথম দিনেই ভোরবেলায় সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছে
এক অদ্ভুত সত্য
তোলপাড় বৃষ্টি হচ্ছে এবং একটা অদৃশ্য কোকিল প্রবল ডাকছে
এও এক অদ্ভুত সত্য
জীবনে আর পৃথিবীতে এই প্রথম ভোরবেলায় সত্য দেখছি আর
ভোর সত্য হয়ে উঠলো
বাস্তবিক গতকালের ভোর দেখিনি
গতকালের ভোর কেউ কি দেখেছে কীভাবে দেখা সম্ভব

কাগজের উপরে হঠাৎ সবুজ
হঠাৎ সবুজ গঙ্গাফড়িং কোত্থেকে এলো
পৃথিবীতে এও এক অদ্ভুত সত্য
গঙ্গাফড়িঙের সবুজে মাথা ভরে গেলো
শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে সবুজ
হৃৎপিণ্ড ছাড়া আর সবই সমস্তই সবুজ
সবুজ ভোর সবুজ বৃষ্টি সবুজ কোকিল
গতকাল সবুজ দেখিনি
গতকাল কেউ কি সবুজ দেখেছে কীভাবে দেখা সম্ভব
এক অদ্ভুত সত্য হৃৎপিণ্ডের খাঁজগুলো আরো গাঢ় লাল হলো
এরকম আগে দেখিনি লিখিনি

প্রিয় লতা

একদিকে পোকায় কাটছে অন্যদিকে বাঁচিয়ে তুলছো তাকে
লতার কি নিজের কিছু করণীয় নেই
লতাই কি পোকাকে উৎসাহ দ্যায় নিশিডাকের নিয়মে
আর তুমি তাকে বাঁচিয়ে রাখছো
আশ্রয়ী শত্রুকে যেভাবে বাঁচানো হয়ে থাকে
উৎপ্রেক্ষার পরিবর্তে
এই সত্যে আমি আজ বৃষ্টির ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে চাই
বিকেলবেলার নীল বৃষ্টি

কিন্তু সত্যিই কি বৃষ্টি হচ্ছে
না-কি কোটি-কোটি সূক্ষ্ম নীল পোকা বৃষ্টির প্রতিমায় ঝরছে
শাদা হাসপাতালের ধূসর রাস্তায় কিংবা
মহাকর্ষ বিকেলের দিকে

প্রিয় লতা তোমার নিজের কি কিছু কথনীয় নেই

মানিক চক্রবর্তী

সাদা ঘুড়ি

স্টেশনের কাছেই এমন শীতের মাঠ
এত সুন্দর বাদামী—
মনে হয় দশ বছর আগের মত কম্পাস, রেঞ্জিং পোল্
আর লোহার চেন দিয়ে মাইলের পর মাইল
সার্ভে করে ফেলি!
এমন শীতের বেলায় সেটা করাই তো উচিত!
উচিত নয়?
দুপুরে, কাছে কোথাও আড্ডা দিয়ে
ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছি, চান হয়নি, খাওয়া হয়নি,
সকালের আঠালো মুখ, ঠাণ্ডা চোয়াল
এখন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো কঠিন হয়ে উঠছে—
মাঠের কিছুটা দূরে সামান্য কিছু লোকের ঘর-বসতি,
একটা সাদা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে কোন্ বাড়ির বাচ্চা ছেলে,
অত লম্বা চওড়া মাঠে
আরো শূন্যতা সৃষ্টি করেছে ঐ একটুকরো সাদা ঘুড়িটা;
আমারও নিজেকে ঐ ঘুড়ির মতই অসহায়, নিঃসঙ্গ মনে হলো!
কোথায় সার্ভে আর কোথায় কি,
বাড়ি ফিরছি এক রাশ জটিলতার মধ্যে। —এক রাশ জটিলতা!
আরো দশ বছর, কুড়ি বছর কি যতোদিন বাঁচি,
এই মাঠ থাকবে,
থাকবে শীতের দুপুর;
তখনো একটা সাদা ঘুড়ি কেবলই ভাসবে, পাক খাবে,
কোনোরকমে উড়বে আকাশের গায়ে—
কিন্তু লুপ্ত হয়ে যাবে না—
কেননা বেঁচে থাকাটাই তার ধর্ম এবং টাল খেয়ে খেয়ে ভেসে থাকাটা—
শুধু মানুষের ধর্ম এ রকম হতে আর কতদিন!

এ বাড়িতে

আমার মৃত্যুর পরে এ বাড়িতে যা যা ঘটবে
যেন আমি এক ছুটির নিস্তব্ধ দুপুরে চেয়ারে বসে থাকতে-থাকতে
হঠাৎ-ই দেখতে পেলাম তার কিছু আভাস।
যেন আমার স্ত্রী ডাকল ঘর থেকে—কে এসেছেন? ডাক্তারবাবু?
না-না এ পাশ দিয়েই আসুন, কিছু হবে না—
যেন আমার মেয়েই সহজে খাট থেকে নেমে এল মেঝেয়
চলে গেল করিডরে
তখুনি একটা টিকটিকি কিভাবে যেন ডেকে উঠল!
—মৃত্যুভয়ে?
ছাদের ওপর সেই পুরনো কাঠবেড়ালিটা তার বাচ্চাকে খুদ খাওয়াতে এসেছে।
আমি মরে গেলেও
আমার বিশেষ আলোচনা এখুনি শুনতে পাই না কিছু!
শুধু বুঝতে চাইছি
আশ্বিনের মাঝামাঝি দুপুরে
সারা আকাশে বাতাসে এখন শরৎকালের রোদ।
একটা ট্রেন চলে গিয়ে আরেকটাও উল্টোদিক থেকে চলে এল;
আকাশে মৃদু-মৃদু মেঘের ডাক—
তার মধ্যে মৃত্যু ঠিক কোথা দিয়ে এসে
টুকরো-টুকরো ভাঙ্গা কথার মত
জীবনের মধ্যে কখন মিশে যাচ্ছে এসে
কে বলবে!

ভাস্কর চক্রবর্তী

বৈশাখের ফোয়ারা

সেদিন দুপুরের দিকে কবিতা পড়ছিলাম : 'হাজার মিথ্যে কথার মধ্যে
সত্যি আছেন ঢাকা'—কার কবিতা, কী বলবো, বিকেলবেলা আমি
মনে করতে পারছিলাম না কিছুতেই, আমার
নতুন বন্ধুর নাম বিস্মৃতি, আমি
তাকে জোরে বাতাস করছিলাম আর ছোট্ট ঘরটা থেকে হাঁক ছাড়ছিলাম :
চা, আমাদের চা।

সে কবে একদিন আমার জীবনটাকে আমি ভাসিয়ে দিয়েছিলাম হাওয়ায়।
দিনগুলো, দিনগুলো ছিলো রাঙতায় মোড়া
মুখগুলো এখনও আমি তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি—
তরুণ নাচিয়ের সঙ্গে এখন আড্ডা চলে দেড়ঘন্টা দুঘন্টা
কথা আর ইশারা তাল আর মুদ্রার ওপর ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সকালে দেখি বিকেলে দেখি
আমার মুণ্ডুটাই ছিটকে পড়ে আছে আলমারির তলায়
আর আমার শরীরটা হাঁটতে শুরু করেছে ঠিক তোমাদের দিকেই।

কী একটা বিতিকিচ্ছির ব্যাপার
স্কুটারের পেটের মালমশলা যেন ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

নকল দাঁত খুলে জাঁদরেল এক ভদ্রলোক এখন চুমুক মারছেন টেবিলে।
যারা বেঁচে আছেন, বারান্দা থেকে
তারা এখন মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন সন্ধেবেলায়—
আমাদের জীবন সুমন্ত সরু একটা গলির মতো—শান্তি না পুরস্কার?
এসো আমাদের চিকিৎসা এবার আমার নিজেরাই শুরু করি—
এবার আর আয়োজন নয় শুধুই, এবার
স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নগুলো চটপট লিখে ফেলা
অথবা গাছেদের কথাবার্তা নিয়ে চমৎকার কাব্যনাটক একটা—

এই তো রাজু এসে গ্যাছে, জীবনটা কীরকম তা
বোঝার আগেই কি রাজু অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে আমাদের?
আমরা কি দুহাজার তিনহাজার চারহাজার বছরের মমি?
একটা পাংশু ধারাবাহিকতা শুধু?

সমাজ নিয়ে আঁরি পয়কার কী লিখেছিলেন আমি ভুলে গেছি।

যা-কিছু আমি তোমাকে বলেছিলাম টেলিফোনে
সে সব কথাগুলো তুমি মুছে ফেলো।

দক্ষিণ থেকে সরোবর পেরিয়ে আজ একটা হাওয়া ছুটে আসছে হাসপাতালে।
পলিথিনের প্যাকেটে এখন ভেসে আছে একটা ফুসফুস
আমরা একদিন নীল রঙের সাতটা ঘোড়া দেখতে পাবো
আমাদের ঘুম একদিন খুঁজে পাবে আমাদের বিছানা
আমরা একদিন পিছিয়ে গিয়ে
বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসবো আবার—
সেটা হয়তো ২০০০ সাল
বিচিত্র সব মোটরগাড়ি আর উড়োজাহাজ, বিচিত্র সব
রাস্তাঘাট আর ঘরবাড়ির
ঠিক কোন্ রাস্তায় আমরা ঘুরে মরছি
ঠিক কোন্ ঘরটায় বসে বসে আমরা গান গাইছি
ঠিক কোন্ রেস্তোরাঁয় বসে আমরা টিপ্পনি কাটছি
বেড-নম্বর বাইশের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আজ শুধুই এসব এইসব কথা।

কি ভাবে

এসো, চুপ ক'রে বসে থাকি আজ। জানলার বাইরে
কুঁজো হয়ে মানুষ চলেছে কুঁজো মানুষের দিকে—
মেঘের আড়াল থেকে বিরাট বিভ্রমকারী থাবা
আবার এসেছে নেমে। শুধু দ্যাখো,
ভালো-মন্দ বোলো না কিছুই।
পৃথিবী চৌচির হচ্ছে, পৃথিবী গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, ভয়ে
ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে সাগরের জল—
মনে রেখো, এসবের মাঝখানে বেঁচে থেকেছি আমরা

কিন্তু তাকে কি ভাবে যে লিখে রাখা যায়, কি ভাবে
কবিতা লেখা যায় এই নিয়ে।

ক্রমশ

শেষ বিকেলে স্টিমার ছাড়ল।
স্টিমারের বাঁশি ফুরোতে না ফুরোতেই
পৌঁছে গেলাম ওপারে।
নদী যে কতটা শুকিয়ে গিয়েছে
এ থেকেই বুঝতে পারবে

আমাদের রেখে দিয়ে স্টিমার
ফিরে গেল ওপারে,
স্টিমারের বাঁশি গোধূলিবেলার মেঘ
হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল পশ্চিমের আকাশে।

ঝাপসা দিগন্তের গায়ে
লেপটে-থাকা জলস্রোত দেখে মনে হয়
একূল নেই, ওকূলও নেই…
কিন্তু আমরা তো জানি
মানুষের মায়ামমতার মতো
সেও শুকিয়ে আসছে ক্রমশ।

ওরাওঁ বুড়ো

রাতের আকাশ জ্বলছে শিখায়,
এ ছবি কেউ দেখেনি।
কথাটা ভুল।
দেখেছে শুধু একজন, ওরাওঁ বুড়ো।

বয়স কত তোমার? প্রশ্ন করো
আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবে আকাশ
বাঁচতে চাও আর কতদিন?
বাঁচতে এখনও ভালো লাগে?
আঙুল তুলে তখনও সে দেখিয়ে দেবে আকাশ

তোমার জিপ ধুলো উড়িয়ে চলে আসছে।
সমীক্ষা শেষ। তোমার আর কোনও প্রশ্ন নেই
ওরাওঁ বুড়ো নিশ্চিন্ত হয়ে এবার
আকাশের দিকে তাকাল,
দেখল, রাতের আকাশ জ্বলছে শিখায়
তার পরমায়ুর মতো।

ইউনিট

আমরা প্রভুর সামনে তরঙ্গে মেতেছি,
অঝোর গানের ঝরনা, মৃদঙ্গ, শ্রীখোল—
দুজনে যে নৃত্য করি হায় হায় হায়
কখনো থামব না
স্বর্গমর্তপাতালের যেখানে যখনই পা,
সেখানে তখন হৈ চৈ।
প্রতিবেশী মানুষকে আলগোছে মাড়াই তো মাড়িয়ে দেবই,
বুড়ি মার মাথার উপরে দাঁড়ানোই দায়
এত পলকা এমন দুর্বল।
ছলছল শব্দে ওঠে আমাদের শিস
যেন এক অনন্ত বারিধি,
যদি বা নাচের বশে ছোট ভাইটার কাঁধে
লাথি মেরে সদ্য ছন্দ ফাঁদি,
বাহবাই দেবে লোকে।

এখানে দাহিকা নীল ভিজে বালি জ্বালে,
চকিত মহড়া দিই হাহাহুহু তালে
প্রভুর সামনে দুই প্রিয় চথাচথী।
জগতে রয়েছে শুধু পুরুষ প্রকৃতি,
কৃতী মানুষেরা জানে এসব বিচার,
বুদ্ধকেও বিভীষিকা দেখাতে পারে মার,
কিন্তু আমাদের লজ্জাঘেন্নাভয়?—হেঁ হেঁ হেঁ।

সূচ

'প্রকৃত জীবন আছে লেখার পিছনে?' এই কথা
বিড় বিড় করে বলি।
কাকে বলি?

'অতিশয় কল্পনার উদর পূর্তি করে মিথ্যা, অজ্ঞানতা'।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন।
এই সূত্রে অনেক নির্মাণ বৃথা গেলো।

ইতিমধ্যে অনেক অনেক রাত্রি
সাতটি তারার তিমির রচনা করে গেছে…

সুভাষগ্রাম

কাল সুভাষগ্রাম গিয়েছিলাম। মেঘের ভিতর দিয়ে যাওয়া। প্রকৃত জল দেখলাম কাল, প্রকৃত আকাশ, প্রকৃত সবুজ যা বর্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, প্রকৃত নির্জনতা। অসুখ থেকে উঠে এসেছি সম্প্রতি; এখন ভয় থেকে এইসব দেখা। একজন প্রকৃত লেখককে দেখলাম কাল যিনি অসুস্থ অথচ যিনি ভয় পান নি একটুও। বললেন 'অন্তত একটা স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবেন শেষপর্যন্ত।'
আজ যখন সুভাষগ্রামের দৃশ্যের মতো একটি স্বপ্নকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলাম, তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো…

রামানন্দ ১

এ-রকম রামানন্দ এঁকেছেন, মেঘ
নেমে আসছে ব্যাপ্ত নিখিলের পরপারে, দিগন্ত রেখায়
ধূম অন্ধকার দ্রুত ধেয়ে আসছে কুণ্ডলী পাকিয়ে
শস্যক্ষেতে তারই ম্লান ছায়া বুঝি শিহর তুলেছে
দিক্‌শূন্যঅর্ণব ঐ নারীটিকে বড়ো ব্রস্তগতিসম্পন্ন এবং
একা মনে হয়
তাকে দেখি, তার ম্লান চলে যাওয়া দেখি
দেখি দিগন্তপারের ম্লান হয়ে আসা তাল-তমালশ্রেণী।

রামানন্দ ২

এ-রকম রামানন্দ এঁকেছেন: পাণীয়া ভরণে যায় তিনজন নারী
একজন গর্ভবতী ক্ষণিক বিশ্রাম নিচ্ছে অর্ধেক শয়ানে
জননীযন্ত্রণা-জাত ক্লেশ আর ক্লান্তির মুহূর্ত বড় গার্হস্থ্য হয়েছে
পাণ্ডুর রঙের রম্য ব্যবহার ছড়িয়ে রয়েছে তার মুখশ্রীমণ্ডলে
ব্যথায় কাঁকিয়ে ওঠা নিস্তরঙ্গ অবসাদ প্রাধান্য পেয়েছে।

সুব্রত চক্রবর্তী

আবার টেবো

ঝর্ণার জ্বলন্ত জলে লাফ দেয় চারটি যুবক
শেষরাতে; টিলা ও জঙ্গলে ঘেরা সমাধিতে সারারাত
শুয়ে ছিলো ওরা…
একা-একা, ওঁরাও-যুবতী ফাটা, ছিনে-হাত অগ্নিকুণ্ডে সেঁকে
শ্লথপায়ে চলে যায়।…দূর থেকে, অকস্মাৎ, তার শুকনো, মরা
নিঃস্ব গান ভেসে এলো।
আগুনের অন্ধকারে জেগে থেকে চারটি যুবক
স্বপ্নহীন ঘোলা-চোখে দেখেছিলো চাঁদের সম্পাত
পাথরের পরপারে। চারিদিকে অপসৃয়মান
অগ্নিকুণ্ডে পুড়ে যায় শীতে দীর্ণ হাত
মনে হয়।…অনন্ত জলের টানে ভেসে যায় চারটি যুবক—
এ কি খেলা! এ কি পরিত্রাণ!
টিলা ও জঙ্গলে ঘেরা সমাধিতে নিভন্ত অগ্নির
স্তব্ধতায় ওড়ে মথ্…দূর থেকে ভেসে আসে
মানুষের চিরদুঃখী গান।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

মেট্যামরফসিস

একজন ভদ্র ও মার্জিত মানুষের কাছে যা শিষ্টাচার
অন্যের কাছে তা নির্বুদ্ধিতা বা বোকামি।
অলক-মেঘ দেখলে কেউ যদি ভেবে নেন জলাধার
বলবো তিনি বহনযোগ্য বেড়া লাফিয়ে পার হতে চাইছেন।
আমি শিকারী কুকুরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যেমন
বিদ্রোহী ভাবতে পারিনা, অনুপ্রাণিত প্রেমিককে
উদ্দেশ্যমূলক, নীতিজ্ঞানহীন, নিঃসঙ্গ মনে করি।
অর্থহীন বিষাদিত, অর্থহীন এ সমস্ত কাম-বিকার!

আসলে এ সবই আমার অনুমান, এ সমস্তই রূপান্তরিত হ'তে পারে
দেশ কাল পাত্র ভেদে! কেউ মারলে দিও মার!
এবার কোচিনে গিয়ে বসে-বসে ভেবেছি, এই সংসারে
আমার খুব দরকার নেই, আমি এক্ষুণি রূপান্তরিত হ'তে পারি
পশ্চাদবর্তী কোন ঘটনার মুখর সমালোচক, ইডিয়েট ধাড়ী—
লালায়িত পতঙ্গের মতো উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ানো—
এ-সমস্তই অ-দরকার।

আমি আরো ভেবেছি যেদিকে রয়েছে সীমাহীন ব্যাকওয়াটার
অসীম অনন্ত নীলাকাশ নিয়ে, যে রকম এ ধরিত্রী সহনশীলা
একটি রমণীও সে রকম নয় কেন, এমন কি জননী পর্যন্ত
প্রয়োজনে বিষ তুলে দিতে পারে, যা খেয়ে নীলকণ্ঠ
পার হয় সমুদ্র শিয়র-কালবেলা,
একটি পতঙ্গ, একটি পশু বা পাখির মতো জন্মমৃত্যু বোধ নেই
জয় নেই, নেই হার!
একজন ভদ্র ও মার্জিত মানুষও শেষে শিখে নেয় ভ্রষ্টাচার!

স্তব্ধ চোখে বিষণ্ণতা

সেদিন ছিল বৃষ্টি ঝরা দিন এবং আকাশ ক্রীতদাসের মতোন
বাবুর বাড়ির কবুতরের হরেক বকম বকম
ঘরের ভেতর সিঁধ কেটেছে চোর—
কিছুই ভাল লাগার মতো নয়, একটু কেবল রাঙা হাতের ডোর।
স্তব্ধ চোখে বিষণ্ণতা ছিল কালো পিচের ভেজা রাস্তা দিয়ে
অশ্রু তো নয় অশ্রুত এক সুর নির্জনতা দরজা ভেজিয়ে।
তাকে আমি বলেছি কতোদিন শঙ্খলাগা সাপের বিবেচনা,
একটি পেলাম বৃষ্টি ঝরা দিন ধ্বনি-তরঙ্গ গভীরতম ফণা
দারুণ ক্ষোভে হাসপাতালের ঘাসে
কালো বিড়াল বিশ্বজগৎ খোঁজে—
একটি মাত্র সারস পাখির ডিম
তা দিয়েছি অন্ধকারে নিজে।
দীর্ঘবছর অপেক্ষাতে গেছে এখনও মনে একটু আশা জাগে
মিথ্যা এ সব রাঙাহাতের চৌল ফেলে রেখে যাব সবার আগে
স্তব্ধ চোখে বিষণ্ণতা ছিল, অট্টালিকা উদ্ভট কল্পনা—
জুতোর কালির উজ্জ্বলতা নিয়ে নিঝুম দীঘি চাঁদের আলপনা॥

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক

রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত বাজছে। টেবিলে একটা পাত্রে বরফের টুকরো। একটা গ্লাস। এবং……হঠাৎ আমার ভেতর থেকে একটি শিশু বেরিয়ে এল। "একা একা কী ভাবছ? এসো একটু গল্প করা যাক্। মনে পড়ছে সেই ছবিটা? একা ঘরে ওরা দুজনে। সুখের চাপা চিৎকার। ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস। দাপাদাপি। তুমি তো উঁকি দিয়ে দেখছিলে। তারপর যুদ্ধ হচ্ছে ভেবে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। এখন সেই যুদ্ধ না করে করে তোমার তলোয়ারে মরচে। সারা শরীরে মাকড়শার জাল।…মনে আছে, সেই ভিখিরি মেয়েটা দরজায় এসে হাত পাতল? তার বুকের জামাটা ছেঁড়া ফালি ফালি। কেন জানিনা, তোমার নজরে পড়লো পাহাড় কিংবা মন্দির, তোমার ভাল লাগল। তুমি বাবাকে প্রশ্ন করলে—ও হাত পাতছে কেন? এখন, বলো তো, তুমি হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছো কেন?"…

এমন কত গল্প হল। তারপর সে কী ভেবে আমার গ্লাসটায় হঠাৎ চুমুক দিয়ে বসল। এবং তারপর। একেবারে অন্য ভূমিকা। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—"বাচ্ছার মত ও রকম টালমাটাল হাঁটছ কেন? অত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চাইছ কেন?"

সে ভাবল, যাক্, কথা বলার মত কাউকে পাওয়া গেল। আমি ভাবলুম, যাক্, কথা বোঝার মত কাউকে পাওয়া গেল। বরফ গলল, গেলাস ফুরোলো। একে অন্যকে বললুম—'আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক।'

বোকা জন্মের কবিতা

বোকাদের পৃথিবী থেকে আর বেরোতে পারি না
চার হাত পা-য়ে বোকাদের জলাশয়ে এতো সাঁতার শেখার ছিলো
কে জানতো বোকা জন্মের আগে—
পুরুষেরা প্রেমিকাদের সোহাগ করে আর বোকা নারীদের স্বপ্নে দ্যাখে
জানতেও পারে না প্রেমিকারা চড়ুইভাতির ছলে বোকা পরপুরুষদের
বহুদূর অবধি যাবার লোভ দ্যাখায় আর বোকা বানায়
—এইভাবে বোকা সংসারে একাগ্রতা নিয়ে বোকা সাজতে ভালবাসে
বোকারা পরিশ্রম করে ছুটি নেয় না ভবিষ্যতের কথা ভেবে
ঈর্ষা করে অমিতব্যয়ীকে আর পয়সা যদি বা বাঁচায় বোকার মতন
ভবিষ্যত এসে সব লুটেপুটে নেয়—
বোকাদের আছে বড়সাহেব ছোটসাহেব আছে সহকর্মী যারা সততার
ভান করে, বোকার মতন থাকে
আদত বোকারা সেইসব বিশ্বাস করে, নিজেদের জীবনযাপনের
প্রতিটি মুহূর্ত ঘামরক্তঅশ্রু দিয়ে অর্জন ক'রে যায়
এমন যে বড়সাহেব ছোটসাহেব সহকর্মীগুছোতে থাকে কেবলই গুছোতে থাকে
বোকারা নামতে-নামতে একসময় নামার কারণ না বুঝে
বোকাদের দেবতা নিয়তি-কে সবসেরা নির্ভরতা দিয়ে বসে—
বোকাদের বাদ দিয়ে লেখা হয় ইতিহাস, বোকারা সেই ইতিহাস পড়ে, পড়ায়
বাইরে কিংবা ঘরের লোকের কাছে সেই ইতিহাসের ঢাক স্বেচ্ছায় পেটায়
—জানতেও পারে না ঝাড়ের যত বাঁশ এভাবেই উৎসাহিত হয়
গরম রসালো বক্তৃতার ছলে দমাদ্দম পেটায় বোকাবংশ-কে

বোকাদের পৃথিবীতে থেকে যেতে সাধ হয়
বোকারা ভালবাসতে শেখায়, তছনছ করে নিজেকে
বেঁচে থাকে এমন এক কল্পনায় যেখানে বোকামিই সাম্রাজ্য
সব বোকারাই রাজা।

মেঘের-ও ঘরবাড়ি

কংক্রিটের শহরে প্রকৃতির সান্নিধ্য প্রায় দুর্লভ
'প্রায়' শব্দটা উঠে যেতে পারে যে কোনোদিন
যখন কি না, এর আগেভাগে আমরা কেহ

লক্ষ্য করি নি সে-অর্থে, মেঘের বেণী লুকিয়েছিলো
ভিতরে-ভিতরে কোথাও, সন্দেহ
উঁকি দেয় নি কেন মনের কোণে

মেঘের-ও ঘরবাড়ি আছে! তার জীবনের সন্ধিক্ষণে
পাওয়া যায় টের
যখন হয়ে ওঠে কার্বনের

মতো আকাশ
যখন বুঝিয়ে দেয় ঘটনা ও চক্রে কতো পলকা-শ্বাস
নেওয়া এই আমাদের-ও দুদিনের গেরস্থালি!

যখন বজ্র দারুণ আনন্দে দিয়ে ওঠে তালি
খাঁচার ভিতর গর্জে ওঠে সিংহ
হালুম ক'রলে তবেই মালুম···এখনো, তোর সন্দেহ!

কৃষ্ণ মেঘ

হলুদ হতেছে ক্রমে জীবনের সব গাঢ় রঙ।
দিনান্তে যাবার আগে
তাহলে স্রোতের পাশে অনুভবে না হয় বরং
দেখি চেয়ে নীলিমায়
কেমনে সাঁতার ক্লান্ত অবেলার নির্মল আকাশে
উড়ে যায় কৃষ্ণ মেঘ
ক্রমশ শৈলের দিকে জন্মান্তের স্নিগ্ধ অভিলাষে।

কেমনে নির্জন বনে পূর্ণগর্ভা সে এক চিত্রল
হেঁটে গিয়ে অসহায়
পান করে দ্বিধাহীন হীরার মতন স্বচ্ছ নদীটির জল।
তারপরে দেখে চেয়ে
অসীম আঁধার বৃত্তে আলোড়িত সেই রশ্মিবিন্দু—
সময় তাড়িত পথে
দেখে ফের আলোকিত স্বপ্নময় সেই মহাসিন্ধু।

সকালের সব রঙ ফিকে হয় স্বাভাবিক বিকেল গড়ালে
মনে হয় সব একাকার—
কেবল নক্ষত্রমালা নীলিমায় রহস্যের জালে
অবিরত ধ্বনিময়।
এ ভাবেই উন্মোচিত জীবনের ক্রমমুক্তি ভবিষ্য সন্ধানে—
প্রতিটি দিগন্ত শেষে
আছে ফের প্রতিশ্রুতি—বুঝি তার সব কথা কৃষ্ণ মেঘ জানে।

মশাল দৌড়

নাও
ছন্দোবন্ধ আমার মূঢ়তা
নাও
বিজ্ঞানের অর্জিত চেতনা
নাও
বুকভরা ভাটিয়ালি গান
নাও
আমার এ যৌন কাতরতা

দৌড়ুতে পারি না আমি আর
একটুতে চোখে অন্ধকার
পেরিয়েছি দশবিশ আল
তুলে নাও হাতের মশাল।

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

অণুবিশ্ব

এখন ঘরের কোণে মৌমাছিদের অনুচ্চ গুণগুণ
হলঘরের প্রবেশ দ্বারের সামনে স্বাগতম পাপোষ
ভেতরের ঠাণ্ডা মার্বেল মেঝেতে আরামপ্রদ
শীত জড়ানো অভ্যর্থনা, বেদীতে বিগ্রহ ঘিরে
জুঁইফুলের গোড়ের মালা
দুচোখে আশ্চর্য দীপ্তিমান শান্তি
সব মিলিয়ে একটা আচ্ছন্ন আবেশের সূক্ষ্ম নীল আভা

বাইরে সবুজ মাঠের রেখা ছুঁয়ে ভরাট গঙ্গার গেরুয়া
ঢেউয়ের ওঠাপড়ায় আকাশের নীল আঁশ,
একটা জনশূন্য নৌকো দুলছে, তার পাশে দুজন
পুরুষ ও নারীর কথাবার্তার আভাস
তারা প্রকৃতির ভাষা সংকেত উদ্ধার করে পড়ে নিতে চায়
নিজেদের সম্পর্কেও কোনো ধীর সিদ্ধান্ত নিতে চায়,
অবশ্য সব চিন্তার শাঁস ও কাজকর্মের শক্ত খোলা
আবেগ ও মেধার মাঝামাঝি একটি স্তরে
চিরকাল আংশিক ও আপেক্ষিক

প্রতিদিন দুপুর ও সন্ধ্যায় সহজাত প্রকৃতি বদলে যায়
সকালে যে সব ভাবনা সাদা থাকে বিকেলে রঙ ধরে
কখনো তামা, কখনো সোনা, কাঠগোলাপের রঙ সূর্যের আভায়
টলটল করে, পাকতে না পাকতেই বর্ণান্তর, স্বত্বটা কখনোই
কায়েমি নয়।
মেঘলা আকাশ, গথিক গীর্জা, ভাস্কর্য ও শিল্প, ক্রমে ছায়ার
পিরামিড, ক্রুশহীন যীশু শান্ত হয়ে অপেক্ষা করে
কবি কখন কোন কথা বলবে—কথার মধ্যে প্রাণবীজ
অসংখ্য কোষের অণুবিশ্ব

সত্যবতী গিরি

মাঝে মাঝে এক একটা রাত আসে

মাঝে মাঝে এক একটা রাত আসে—
আমার আকাশের তারাকে নিভিয়ে দিয়ে
তরল অন্ধকার বাসা বাঁধে
মস্তিষ্কের অনেক গভীরে কোথায়-কোথায়-আমি জানি না—জানি না।
আমার মথিত স্মৃতির ভেতর মৃত মানুষের কঙ্কাল,
ঊনপঞ্চাশের বন্যায় ভেসে যাওয়া পশু ও মানুষের পাশাপাশি শব—
সুন্দরবনের বিশাল বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে
কোনো এক সম্পর্কিত মাতামহীর মুখে প্রথম শোনা যৌন মিলনের
উগ্র গন্ধ—তখন আকাশ অনেক নীল ছিল—
আমি সেই অন্ধকারের ভেতর কোনো জননীর জরায়ুকে খুঁজে পাই না।
বিধ্বস্ত হয় আমার আত্মা—আত্মা নয় অহং—আমি পালাতে চাই।
এক গৌরী বালিকা আঙুল তুলে তার গলার ফাঁস দেখায়—
আমি তার সঙ্গে যেতে চাই, সে উল্টোদিকে হাঁটে।
বিশাল ভুবন অন্ধকারে ঝলসায়—
উপকণ্ঠে শেষ হওয়া জনবসতির তালগাছ
তার পাখা নেড়ে আমায় বলে
তোমাদের জন্যই তো আমায় চলে যেতে হচ্ছে
আমি স্বপ্ন দেখার জন্য অন্ধকার সাঁতরে তীরে উঠি।
সেখানে সবুজ ধান আমার দিকে আঙুল তুলে বলে "সর্বনাশী"
আমাকে নষ্ট হতে দিলি কেন?
এত বেশী অভিযোগ আমি সইতে পারি না—
তাই ফিরে আসি ট্রামের চাকার তলায়—যেতে চাই মনুমেন্টের চূড়োয়—
অথবা অন্ধকারে ঘুমের বড়ি—কিংবা অন্য কোনো—অন্য কোনো—
অন্য কোনো অমানিশা—
হো হো হাসে শাকম্ভরী—প্যান্ডোরা তার বাক্স বন্ধ করে শাসায়—
অন্ধকার থেকে বধির আলোয় আমি আবার আশ্রয় নিতে বাধ্য হই
মৃত বনস্পতিদের অজস্র শবের মাঝখানে।

জীবন তোমার কাছে

জীবন তোমার কাছে দাবী করে আছে জেনো
প্রত্যেক মুহূর্তে তুমি নারী।
কখনও কবিতা, নদী, ঘাস, ফুল হতে চেয়েছিলে?
আবিশ্ব রোদের তৃষ্ণা বুকে নিয়ে নেমেছিলে পথে?
তাই ওরা বলে গেল তুমুল প্রচারে
প্রত্যেক মুহূর্তে তুমি নারী।
শরীরে স্নিগ্ধতা নিয়ে স্তব্ধ জল জেগে থাকে প্রচ্ছন্ন পাথরে
তাকে যদি কোনোদিন আকাশ দেখাতে চাও ভুলে—
যদি তাকে তুলে নাও পাঁকের পিচ্ছিল স্নেহ থেকে
তর্জনীতে ঘৃণা মেখে পরিপার্শ্ব তখনই শাসাবে
ভুলে গেছো তুমি শুধু নারী?

তার চেয়ে এ বিকেলে উঠোনের নিকোনো ছায়ায়—
ফুল থেকে ফল তোলা কত হোলো সে হিসেব করে
সময় কাটাতে পারো অনায়াসে মসৃণ আরামে।
কোনো ভূত কিলোবে না—বরং বাতাসে বলে যাবে
এই বেশ পাওয়া গেছে পোষমানা ঠিকঠাক নারী॥

বিশ্বাস

আমি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি।
আমার মনে হচ্ছে
কেউ কোনোদিন মিথ্যে বলেনি।
পৃথিবীর ভিতর কোনো গভীর ভালোবাসা
চোখ বুজে অশ্রুপাত করছে

সারাটা দিন ভেসে
আকাশে মেঘের দাপাদাপি
কোন্ পৃথিবীতে কী আছে তাই বলাবলি করছে।

তাদের বুকে তখনই আর এক কষ্ট জমা হচ্ছে
সব কুচো চিংড়ি সারডিন মাছের ঝাঁক ধরে
পরিচয় হচ্ছে
যেন সহজ কাজ আর একটাও নেই পৃথিবীতে।

যার বুকে প্রেম নাই

যার বুকে প্রেম নাই
তার যুদ্ধ মরে গেছে
শসোর সবুজ তাকে কখনো ডাকে না
ফুলের বাগানে তার প্রবেশ নিষেধ
যার হাতে যুদ্ধ নাই

তার ছায়া দেখে হিসি করে পথের কুকুর!
যার হাতে যুদ্ধ নাই
তার প্রেম মরে গেছে
কোনোদিন তার বুকে
তার ধ্যানের প্রতিমা জবার পাপড়ি খোলে না
তার আত্মজের হাসি
কোনোদিন তার চোখে স্বর্গের বিভূতি আনে না…
যার বুকে প্রেম নাই
তার গানে বমি করে গণিকার নষ্ট নূপুর!

এই অস্তিত্ব

হে স্তন, রাতের শিশিরের ঝ'রে-পড়া কান্নার নিঃশব্দ গান
তুমি কি শুনতে পাও
হে অন্ধকার, হে আড়াল
পৃথিবী জুড়ে সংঘর্ষ-সন্ত্রাস
তুমি কি আমার বেদনা, ভয়
আতঙ্ক স্বপ্নের বিচ্ছিন্ন-যৌনতার
হে নিঃসঙ্গতা, স্পর্শাতুর এই দুটি হাত
আবার নতুন জন্ম, নতুন যৌবন
গন্ধ আলোড়িত প্রতিটি রক্তবিন্দু কথা ব'লে উঠবে
শিকড় বেয়ে জল ডালপালায়
একাগ্র স্তনের মন্ত্রের নক্ষত্র জ্বলজ্বল ধ্যান
কতকাল এই শরীর বীজের
দৃষ্টির ভাষায় নীরব
শুধু তৃষ্ণায়, শুধু স্তব্ধ ঝড়
হে বসন্তের বাতাস, হে কাঁপন, স্বপ্ন-তরঙ্গ
স্তনাগ্র ছায়ায় অন্ধকার
রৌদ্র-হননের এই জীবন
কাঁটার রক্ত-ক্ষরণ
বাঁচার প্রতিটি মুহূর্তের নগ্ন যন্ত্রণা
সুধা, হে সুধা
চুম্বনে চুম্বনে আত্মধ্বংসী এই অস্তিত্বের
কে, সে কে, নীল বিষের আর্তি শুষে নিতে চায়!

জন্মান্তর

তুমিই আমাকে জন্ম দিয়েছো
নিঃশব্দ বীজ
মাটি, জল, সূর্য
কলরব
রাত্রির স্তব্ধতা !

ডালপালায় আজ
ঝুলন্ত ফল
পাখির ঠোঁট
আরেক জীবন
জন্মান্তর !

উত্তম দাশ

চোখ

হে শিক্ষানবিশী চোখ
স্বাস্থ্যের কারণে এই গোলাকৃতি পর্যটন,
যে সব প্রতিবিম্ব টেনে নিয়েছো
তাদের নিজস্ব অবয়ব থেকে শুধু দৃশ্যই নিলে,
স্পর্শ ও ঘ্রাণ পড়ে রইল একাকী
হায়, শুধু শরীরই তোমার প্রার্থনা হলো ?

কথোপকথনের মধ্যে মূকতার চেয়ে
বেশী ছিল সমর্পণ,
ছিল নির্ভরতার কথা।
বেদনার উৎসে এখন আর কোন দৃশ্য নেই,
তোমরা সজীব হও, হে বৃক্ষরাজি
হে পথের তৃণসকল তোমাদের কি দৃশ্যবোধ আছে ?
ঘ্রাণের শরীরে এত স্পর্শ কাতরতা
ভুল করে জড়িয়ে রেখেছো—

এখন শিক্ষানবিশী চোখ
স্বাস্থ্যের কারণে গোলাকৃতি পর্যটনে
নিযুক্ত রয়েছো।

কৌশিক গুহ

সমুদ্র ও ঊর্মি

অলিন্দে লেগেছে ঢেউ, একা
সমুদ্র আসছে তার ঘরে।
পথে ঊর্মি মেয়েটির সঙ্গে হল দেখা
দুজনে আসবে হাত ধরাধরি করে।

বুকের দেওয়াল ভাঙ্গে ঢেউ
জ্বলে বিজ্ঞাপন, 'মেড ফর ইচ আদার',
সুখের খেয়ালে তবু কেউ
অলিন্দে দাঁড়িয়ে ভাবে ঘর সংসার।

একজন খুঁজেছিল কথা
অন্যজন খুঁজে পেল ভয়।
জুড়ে দিয়ে জন্ম নেয় ব্যথা
জরাসন্ধ করে নয় ছয়।

সমুদ্র ক্লান্তিতে বড় ম্লান
জোয়ার জেগেছে তাই ঊর্মির শরীরে
কে আর করবে বলো স্নান!
শহুরে আলোর নীচে, একা অন্ধকারে।

বিষ্ণু সামন্ত

পদযাত্রা

দু'ধারে কঞ্চির বেড়া। বাদামের বন।
মাঝখানে চওড়া রাস্তা। বালিময়।
শুকনো শাদা নরম ঝুরঝুরে।
এঁকেবেঁকে চলে গেছে কোথায়।
অজস্র পায়ের ছাপ। হাল্কা। গভীর।
কিন্তু কোনো গল্পের রেশ নেই।
পাশাপাশি ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই।
মাঝে মাঝে পাতার আড়ালে
অচেনা পাখির ডাক।
হঠাৎ নজরে পড়ে কয়েকটি কবরস্থান।
বিকেল গড়িয়ে যায়। আমি
পা চালাই। কতদূর।
ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে লাইট হাউস।
স্থির দাঁড়িয়ে। আকাশে চূড়া। অপলক।
হেঁটে এসেছি কত রাস্তা।
এখনো বাকি অনেকটা পথ।

ভাবনা

বসে থাকি, চুপ করে বসে থাকি
ছাদের দিকে চেয়ে, জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে
ঘরের ছাদে এলেবেলে ছবি জলের দাগে পষ্ট হয়ে আছে
দুটো কিংবা তিনটেও হতে পারে টিকটিকি অলস পায়চারি করছে
ছাদ বেয়ে; শিকারের সম্ভাবনা কোথাও দেখা যাচ্ছে না
ভাবছি সামনের বর্ষায় নির্ঘাৎ জল পড়বে কিংবা ভাবছি
কিভাবে দাঁড়াবো একটু সোজা হয়ে, সকালে
কোমরটা বড় জানায় আজকাল
—বাইরে ছেলেটা কেমন আছে কে জানে, যা দিনকাল!
'ওর বাবার কাশিটা বেশ কিছুদিন হলো সারছে না কেন'
বসে থাকি, এভাবেই বসে থাকি, আমাকে বসতে
দেখলেই এখন ভাবনাগুলো গুটি-গুটি পায়ে হেঁটে আসে
কবিতার কথা ভাবতে গিয়ে এইসব ভাবি
বলুন, এভাবে কি কবিতা হয়, বলুন আপনি

এখন কেউ চায় না

যে যার নিজস্ব পথে এগিয়ে যায় অভিষ্ঠ লক্ষ্যে;
প্রয়োজনে এগোয়
প্রয়োজনে পিছোয়;
সময়ের ভ্রূকুটিকে দেখিয়ে বুড়ো আঙুল।

অঢেল সময় নেই হিসেব রাখার
রাত ভোর ঝরে পড়লো কতো শিউলি
শিশিরের বিছানায়।

ডুবুরীর মতো ডুব দেয় সবাই শব্দসমুদ্রে;
তুলে আনা শব্দে
মালা গাঁথে
কল্পনার সুতোয়;
রাজবাড়িতে পৌঁছে দেবার চলেছে প্রতিযোগিতা;
সকলেই চায় পৌঁছে যেতে রাজবাড়ি সবার আগে
এখন আর কেউ চায় না থাকতে পিছনে পড়ে।

বইমেলার টেবিল থেকে

পাঁচ-দুই তারিখের কবিতা

সে যেন একটা গড়ানে-পাথর। স্থিতিশীলতা হারানোই যেন বা তার স্বভাব। এধার থেকে ওধারে যেতে, যেতলে ফেলে ঘাস গুল্মের মাথা; এমন কি কাঁপিয়ে দেয় সূর্য প্রণামের স্তব।

একটা পাথরের হাত ধরে পাঁচ-দুই তারিখে সে এসেছিলো বইমেলায়। যদিও পরীর মতো ডানা মেলে হাঁটছিলো, তবু তার পায়ের নিচে দলিত হলো যে ঘাস ফুল, ফড়িং-এর নরম পাখনা, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ-হীন স্বভাবসিদ্ধ চলে গেলো। (আগে কিন্তু সে এরকম ছিলো না; তার গমনে একটা ভঙ্গিমা ছিল, হাসিতে মুক্তো না হলেও একটা রক্ত-জল-করা ব্যাপার ছিলো, পায়ের পাতায় ছিলো মাটির মমতা মাখানো।) শুধু আমার টেবিলে জমা পড়লো দশ বারোটা বই; কিছু কণ্টাজিত হাসি ঝরে পড়লো।

বেলে পাথর না গ্রানাইট হে তুমি? না, রাংতায় মোড়া ঝুটো মুক্তোর দানা! তুমি যাই-ই হও, আমি বলি, তুমি লাফিয়ে পড় কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে। তুমি চোচির হও, বালুকণা হও; কান্নায় ফেটে পড় তুমি। ধুলো হও হে, ধুলো; মাটি হও হে, মাটি। তোমার দপ্‌দপে পাথর আমি একযুগ বহন করে এসেছি। শ্যাওলা হলেও, একটা সবুজ আস্তরণ পড়ুক তোমার শরীরে। আমি বুক দিয়ে আগলে তো রেখেছি, তোমার বুকের কালো শব্দগুলো; এবার তারা নড়েচড়ে একটা রঙিন চাদর হয়ে উঠুক তোমার গায়ের।

আবেগ পরিমিত

একটু বাঁকা একটু ফাঁকা দুটি অলোক উরু
প্রতিদিনের কাজের শেষে রাতের সবে শুরু
তখন থেকে টানছে কাছে উরুর মালকিন,
উরু তো নয় স্বর্ণকমল চেনাচ্ছিল দিন!
রোদের দিন রঙের দিন এল শহর জুড়ে
শহর মানে যাপন শুধু, জীবন খানি মুড়ে
রাখবে গাঢ় ঘন কাঁথায়, শীতের রাতে তাকে
গ্রীষ্মে দেবে সজল হাওয়া দুঃখী আয়ুটাকে।
কিসের ভুল? কে বলে ভুল? কিসের জারিজুরি?
ভাসছিল সে সহজ স্রোতে ছুঁয়েছিল বুড়ি,
বুড়ি ছুঁয়েছে ঘর ছাড়েনি বাহির ছাড়ে নি সে,
ঘর বাহির রঙ্গ ঘোরে কেমন গেল মিশে।
সেই তো পারে খেলতে মাঠে যে জানে ঠিক সুতো
ছাড়তে দূরে টানতে কাছে আবেগ পরিমিত!

সুরজিৎ ঘোষ

সাঁতার কাহিনী

সমস্ত যৌবন ভরে পথে পথে আলো ধরে, আসলে নিজেকে শুধু ক্ষয়—আত্মজীবনীর এই পাঠ বড়ো একঘেয়ে, মলিন হয়তো বা কিছু রহস্যময়ও, তবু এরজন্য তিন লাইন কথকতা খরচ করার কোনো মানে নেই। তেরো বছরের মতো শাসনে থাকতে থাকতে কতো রোগা পাটি কর্মী মোটা হয়ে গেল, তবু রতনের দাদার সংশয় কিছুতে গেল না, এই নীতি শেষ-মেষ টিঁকবে তো এই ভেবে ভেবে রতন ক্যান্সারে ভুগে মরে গেল ঠাকুরপুকুরে। আঃ, এত বোঝ এটুকু বোঝনা, বদলে বদলে যেটা টিঁকে থাকে সেইটাই নীতি। নীতিকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেদের সরে যাওয়া নিশ্চয়ই ভালো কথা নয়। সাতাশ বছর থেকে এ-ভাবেই কেটে আসছে তাদের সময়, তখন জন্মচক্রে সূর্য ছিলেন আর এতদিনে হেলে পড়ছে চাঁদ।

সূর্য লিখতেই তার বিহান বেলার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে ঢেঁকি ছাঁটা চাল। গরম ভাতের ধোঁয়া, কাঁচালঙ্কা মাখানো সকাল। মেঝেয় আসন পিঁড়ী সেসব সুখের দিন আহা, এখন চারবেলা ছেড়ে দিনে একবারও ভাত স্বাস্থ্য নির্দেশের পক্ষে অপমান। শুধু টিঁকে থাকতে গিয়ে কেমন বদলে যায় বেঁচে থাকবার অনুপান। কৈশোরের কথা তাই বেশি না-লেখাই ভালো। যৌবন তো আগেই বললাম।

তার চেয়ে ফেরা যাক শৈশবের মায়াবী দুপুরে—ভালোবাসা শব্দটির তখন অন্য কোনো গূঢ়ার্থ ছিল না, মায়ের কোলের দাবি। চাটাইয়ের মতন বিছানো দিদিমার আমসত্ত্ব ছাড়া জটিলতা শব্দটির বানান জানলেও অর্থবোধ ছিল না কারুর। তখন পাশের বাড়ি, কাকাবাবুদের বড় মেয়ে মোম ছিল প্রিয় সঙ্গী, অযৌন খেলার সাথী দিন রাত, রাত আর দিন। কিন্তু তারা বড় হয়ে উঠবার অনেক আগেই দু বাড়ির মাঝখানে বসেছে পাঁচিল, যার উপরে কাচের টুকরো, কেবল বেড়াল ছাড়া আর কেউ ডিঙোতে পারে না।

তাই ভালোবাসা নয়, শৈশব-কৈশোর নয়, যৌবনের অপমান নয়। শুধু রূপকথা হয়ে এই ভেসে চলাটুকু সত্যি হোক, চিত্র রূপময়।

অজয় নাগ

ইতিহাস

মাতৃহীন অজানা জীবন—পাথরে পাথুরে ছায়া

শেষের কার্নিশের থেকে
বায়ু-ভাঁজে ধূলি-রেণু-গন্ধ-কাম ছড়ানো ছিটানো
বিদেশী কুয়াশা
ভাসে হিমরঙ কেন্দ্রমণি-ছিন্ন-লোম…

রকেটের ককপিট থেকে কখনো হলুদ হ্যান্ডবিল—
কল্পনার ভূমা

আমাকে কি কারও মনে পড়ে…

স্মৃতির মাস-মজ্জা-চোরাটান—পা থেকে মাথা
শিরায় শিরায়
সবুজ অবিনশ্বর মায়া শামিয়ানা—
আহা—দয়াবতী শচীমাতার নয়ন ছলোছল…

নির্ভার

নিজেকে নির্ভার ক'রে রাখি।

কোনো কোনো দিন
দুশ্চিন্তায়
নুয়ে পড়ি,

আকাশ দেখি না—

রাতে
বিছানায়
শরীর ছড়িয়ে দিলে
নিজেকে পাথর মনে হয়।

আবার ছুটির দিনে
আকাশের দিকে চেয়ে
ছাদে ব'সে থাকি চুপচাপ,

আমার ভাবনা
আমাকে ছাড়িয়ে
মিশে যেতে থাকে দূরে নীলিমায়—

ছড়ানো আকাশ
আমাকে নির্ভার ক'রে যায়।

দশদিন

জীবনে প্রথম আমি চিঠি পাই চোদ্দ বছরে
ক্লাস এইটের ছাত্র, কিন্তু এক বছরের বড়ো
মেয়েটি তখন যেন আমার বুভুক্ষু খালি পেটে
কস্তুরীর মতো, সে কি অসম্ভব খিদে, কিন্তু ভাত
নয়, রুটি নয়, মাছ নয় যেন মানুষ সমান
বকুল ফুলের মধ্যে আমি গলা অব্দি নিমজ্জিত
শুধু মাথা বের করে দাঁড়িয়ে রয়েছি সারাদিন।

পাছা ছেঁড়া হাফ প্যান্ট হাভাতের ছেলেরা কিভাবে
প্রণয় গ্রহণ করে দেখা আছে। রতিবোধ নেই
তবু লক্ষ মুখ খুলে রেখে আমি গলিতে গলিতে
ঘুরে বেড়াতাম, পায় কে আমাকে, মাত্র দশদিনে
আমার শরীর হবে অমর, প্রতিটি অঙ্গ হবে
অক্ষয়, অজেয়, ক্লাস এইটের ছাত্র, মনে আছে?
কস্তুরীর ঝাঁঝাঁ গন্ধ, দুনিয়া কাঁপানো দশদিন।

আজও

কাজল পরাবার নাম ক'রে
কোনো চোখের পাতায় লেখা হলো না একটি কবিতাও

চোখ মেললে চোখ মুদলে পড়া যাবে স্পষ্ট :
আমাদের পোড়া মাছ জলকে চ'লে যায়।

ঢাকের কাঠি

ঢাকের উপর মাথা রেখে ঢাকিরা ঘুমায়
আমাদের ঘুম নাই, আমরা ঢাকের কাঠি নাচাবো

এই দুপুরবেলা মা দুগ্‌গা ঘুমায় ফুলবেলপাতা ঘুমায়
পুরোহিত ঠাকুরও নাই
আমরা ঢাকের কাঠি নাচাবো

ঢাকের কাঠি নাচতে নাচতে আমাদেরও নাচাবে
আমরা কি নাচবো ঢাকের মাথায়

আমার শত্তুরের বাগানে

রজনীগন্ধা দাঁড়িয়ে ভিজেছে, একা।
লুটোচ্ছে ধুলোয়।
আমার শত্তুরের বাগানে।
দেখে চলে যাব কী করে তা হয়!

এত ঘন বৃষ্টি হল কিছুক্ষণ আগে,
ধুয়ে মুছে যায় নি শত্রুতা?
লাঙলের ফালে বুক রোজ খুঁড়ি,
কেউ এসে উপুড় মুঠোর থেকে বীজ দিক,
সার দিক হৃদয়ের, ফসলের ভারে বুক ভারী হয়ে যাক,
আমার বৈরীতা বাঁচে এভাবে নিশ্চয়ই?
কুঠার আমারও আছে, জোরাল, ধারাল,
কিন্তু যুপকাষ্ঠ স্পর্শ করে ভাবি, এই এইমাত্র
উঠোনের চাঁদে এসে শত্তুরের ছোট ছেলে
জ্যোৎস্নার বল নিয়ে খেলা করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নত, ধ্বস্ত, রজনীগন্ধার ডাঁটি ধুলোয় লুটোচ্ছে;
আমার শত্তুরের বাগানে।
দেখে চলে যাব কী করে তা হয়!

অনুরাধা মহাপাত্র

ভূতের চাহনি

একজন চণ্ডালিনী কি করে পাখির স্বরে কথা বলে
তামাটে ঝাপট লাগে দুপুরবেলায়।
কখনো বিবাহের গান গায়
কখনো ঝড়ের সমুদ্রে
হারিয়ে যাওয়া জেলে প্রেমিকের…
কখনো মাঝরাতে ঘুম ও শোকের গলা শোনা যায়
প্রেমিক পাখির ডানায় আগুনলাগা
ডানার উৎসব।

—কল্পকথার কোনো মানে নেই,
স্বর ওঠে চেরানাক বাতাসের,
এখানে যুক্তিবালির প্রয়োজন
কিন্তু যার পোড়া গালের আভা
একবার আগুনে চমকে ওঠে—
তার দিকে তাকাতেই দুদিকে অন্ধ করা বাঁকা গাঁথা ঠোঁট

সত্যের অতিরিক্ত মায়াজীবন ও নক্ষত্রের লাফ্
এখনি ধরতে হবে ক্যানিং লোকাল।

শেষ তুমি

আজ বসন্তের শেষ।
কেউ ধর্মবক, কেউ উত্তরহীন
খাঁ খাঁ করছে গলিপথ—
পোড়া নোখে জলহীন ছিটকে পড়ছে
শিশুদের বাসি হাসি।

কবেকার কাঠচাঁপার কথা মনে হল
কবেকার, অর্ধেক শিয়ালে খাওয়া উপাচার
সেদিন পথে কারো উপবাস নেই,
শুধু, পুজাহীন নিকষ মূর্তি-ভাসান।
ওই ছেলে, একবার, জিভে আলপিন ফুটিয়ে দিলেই
এসব স্বপ্ন হয়ে কথা বলে, পোড়া নিদ্রায়।
এসব কি অর্ধবালক আর অর্ধবালিকার খেলার চকিত ভাষা?

এই খেলার নেশার বশে
কারো অস্বচ্ছ গরল লেগে থাকে আমার গলায়
তবু, তোমার কাছে এলে, আমি সরল হই
জটিল জলের অধিক
তবু, তোমার কাছেই…

ঘ্রাণ

শীতের দিনের মতো দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে বলে
আমি আর গোলাপি করবীর উঁচু ডালে
নাগাল পাই না। সেদিন সকালে উঠে দেখি,
এক ডাঁটি রজনীগন্ধা লম্বায় আমার সমান,
আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই গন্ধ নিই তার।
এখন আমি ঘাসফুল আর বুড়ো আঙুলের নখের মাপে
চন্দ্রমল্লিকার সন্ধানে আছি,
সমান উচ্চতা পেলে গন্ধ নেব বলে।

পুনর্ভব

সারা গায়ে পেপারওয়েট্ চাপিয়ে রাখি,
কাগজের মতো যদি উড়ে যাই!
হাতের চেটো খুব পাতলা বলে
একটু বাতাস পেলে ওড়ে।
কনুই ধরে টেনে আনি নীচে,
শিলনোড়ার তলায় গুঁজে রাখি।
পা দুটো মাঝে মধ্যেই ক্রেপ্ কাগজের রোল হয়ে যায়,
যেখানে সেখানে ওড়ে রঙিন ফিতের মতো।
কোমর পর্যন্ত গুটিয়ে শক্ত দড়ির পাক দিই,
যেন কোনভাবে না খোলে হাওয়ায়।
এভাবেই আমি বুক পেট পিঠ মাথা
ভিন্ন ভিন্ন পাথরের নীচে শুইয়ে রেখেছি,
এখন আমার সাদা ঘাসের মতো শরীর।
তবু পায়ের নীচে আরেকটা পা
হাতের পাশে আরেকটা হাত জন্মাচ্ছে টের পাই,
রোদ আর আলো থেকে ক্লোরোফিল্ শুষে নেবে বলে।

আয়

আয়, তোকে আনন্দ ডেকেছে।

অঙ্গারে ছিলিস এতকাল।
দহনে ও দাহ্যে শুধু ভিক্ষে চেয়েছিস
নিজেরই কঙ্কাল!

এ-বিনয় নির্বোধের ভাষা।
গা-পোড়া দুঃখেই শুধু বাসা বাঁধে
গোঁয়ার হতাশা।

আগুনের মধ্যে থেকে কী তবে নিলি?
রাগ নয়? ক্রোধ নয়? অপমান-
ভিক্ষা শিখেছিলি!

লজ্জা তোর অনুগামী! বিদ্রোহ নয়?
নিজে পুড়ে এনেছিস সনাতন
ভস্ম পরিচয়?

মাথা তুলে আজ শক্ত পায়ে আয়।
নিজের সর্বস্ব দিয়ে শুরু কর
ঐতিহ্য আদায়।

যা গেছে, তা শুধু সর্বনাশ-খেলা।
আনন্দ ডেকেছে তার শারীরিকে, মনে—
আয় এইবেলা।

শান্ত রায়

যে-হাওয়া সবার

আমার বেদনা আমি বিরলে ভাসিয়ে দিই হাওয়ায় হাওয়ায়
যে-হাওয়া সবার, যাতে কোনো সাজসজ্জা নেই, ঘোরপ্যাঁচ নেই—

সব সময় 'তা-ও' হয় 'না,' তাই ঠাসা মেঘ জমে, বিদ্যুৎ ঝলসায়
ধুলোয় আকাশ ঢাকে, মড়মড় করে গাছ, যাত্রীসহ নৌকা থরথরায়

হাওয়া কি সবার কাছে যায়? হাওয়া সবাই কি সত্যি সত্যি চায়!
উপকরণের কোনো শেষ নেই, বাদ্য বাজে—হাওয়া ওড়ে, পালক নাচায়

আমার খুদকুড়ো ছাড়া কিছু নেই, দিন-আনার মতো কোনো কাজ অব্দি নেই
জল আসছে চোখে—ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়—হাওয়া কাছে এসে
আঙুল ঠোকরায়

বাজি পুড়ছে বাজি পুড়ছে একা-একা ভাবি আর এক কোণে থাকি
'আমার কী সাধ্যি, বলো, বিস্ফোরণ ঠেকাবার?' শুনে হাওয়া চোখ
মটকে হাসে

সুদীপ বসু

আছি উপদ্রবে

তুমি ঘরে ঢুকলে আকাশে
আলো জ্বলে
ঘরে তুমি নেই চাঁদ আড়াল হয়। আহা এই আঁধারে
আমি একা একা
বাস করতে পারি অগ্নিব্রত? এই ঘরে—

আজকাল মশা মাছির ভীষণ উপদ্রব।

গায়ত্রী

ভর দুপুরে গায়ত্রীদি ঠাণ্ডা উনুনের পাশে বসে
কাঁথা সেলাই করে
এই বাড়ির ভাতের হাঁড়িতে আজ হৈচৈ নেই
গায়ত্রীদি অরন্ধন ব্রত পালনে মুখ বন্ধ রেখেছে।
শুধু বুকের উত্তাপে
সদ্য ফুটে ওঠা এক জোড়া লাল গোলাপের আঁচে
গায়ত্রীদি দাহ করে

বেদগ্রন্থ, বাদামী শস্য, নিজের কুশপুত্তলিকা।

ল্যাণ্ডস্কেপ ইন দি মিস্ট

দুটো পাতা খালি ছিল, সে দুটো পাতাই আজ
সম্পূর্ণ হয়ে গেল চোখের নিমেষে—এত কথা!
কোথায় ঝিনুকে মুখ রেখেছিলে রাত্রিবেলা, মনে পড়ে?
এত মুক্তো! কী করে জমল ওষ্ঠে আর চুম্বনের শব্দ
যেন জলতরঙ্গের আঘাতে ঘুম ভাঙ্গল তোমার
হে নিশিজাগরণ। যত দিন যাচ্ছে আমি ততই
নতুন নতুন পাখনা জেগে উঠতে দেখছি জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে
তুমি হাঁ করছ, জায়মান তারা।
তোমার মুখগহ্বরের অনন্ত কৃষ্ণগর্ভ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে
তারা সাজাচ্ছে নিঃসীম আকাশ।
খসে যাচ্ছে জন্মমৃত্যুর কুয়াশা, রহস্যমালা—গোলাপী
পর্দার আড়ালে ট্রামপেট বেজে চলেছে একটানা
অ্যাঞ্জেলোপোলাস। ল্যান্ডস্কেপ সরে যাচ্ছে. পথের অন্তিমে,
অপেক্ষমান পর্বত পড়ে রয়েছে মহম্মদের জন্য হত্যা দিয়ে,
সুষুম্না আচ্ছন্ন করে এইমাত্র নির্বাপিত পথ বেয়ে চাঁদ
উঠে এল ঝিনুকের অস্পষ্ট মুখমণ্ডলে।

মাছ-বড়শির গান

কুঁচিয়ে হলুদ বোঁটা অব্যর্থ আঘাত ছররার
ছটপটাচ্ছে কবুতর ছোট খরগোশ দেবদূত
গোঁ গোঁ গোঙানির ঐ অব্যক্ত বোবা আকাশে
নিভে গিয়ে জ্বলে উঠে ফের নিভে গেল উজ্জ্বল তারা
লোকে বলবেই 'স্বাভাবিক মৃত্যু'
বলবেই লোকে 'এ মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক'
এই সরোবরে প্রতিদিন কত বালিহাঁস আসে
যেন ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান ভীষণ ভয়ানক
তরুণ ডানার ছন্দে রঙিন বুজকুড়ি ওঠে কিছুদিন
তারপর ফাঁপা বেবাক শূন্য বিহ্বল চেতনা…
ফটিক জলের নিচে নিরন্তর…
মাছ-বড়শির গান…চোরাটান ঘূর্ণির
পৃথিবীর তনু শিকারীরা শুঁৎ পেতে অস্থির
রিপন স্ট্রিটের মোড়ে, দিল্লির কেল্লায়।

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

আর এক জীবন

আমার অতীত নিয়ে যারা হাসে
হাসাহাসি করে
তারা ভুল করে।
পনেরো বছর আগে
যেন ফাটা কলারের কোট আর সোয়েডের জুতো
অন্ধকার থেকে হেঁটে গেছে আরো অন্ধকারে।
সে এখন ব্রীজের উপর থেকে
কালো মানুষের ক্লান্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া দেখে।

শত্রুর ক্রোধের সামনে যারা মরে
তাদের মুখের হাসি মানুষের মতো।
অন্ধকার কালো জলে শৌর্য ছুঁড়ে
কেউ চলে গেলে
লোমশ-আঁধার তাকে আরো গিলে খায়।

আমি চাইনি ককপিটে যেতে
চাইনি প্রবল হাওয়ার মুখে
মুখোমুখি ধ্বস্ত হয়ে যেতে।
শুধুই চেয়েছি আমি
ধীরে হোক তবু যেন একটু উপরে যেতে পারি।
বলতে পারি দু-হাত বাড়িয়ে,
হোক অকিঞ্চিৎ
তবু আরো একটা জীবন দাও
যেন গুটি থেকে প্রজাপতি উড়ে যেতে পারে।

দীপক রায়

অজ্ঞাতবাসের চোদ্দদিন

জিজ্ঞাসা কোরোনা এই চোদ্দদিন কোথায় ছিলাম আমি।
জলে ভিজেছি এই চোদ্দদিন; আমাকে আর ঠাণ্ডা জলে
চান করিও না। আমি খুঁজে পাইনি গলি, আমার ফেরার রাস্তা।
অন্ধকার হয়েছিলো এই চোদ্দদিন। শুধু ফেরার কথা ভেবেছি।
খুঁজে পাইনি গলি। তখন ছিল অন্ধকার অন্ধকার থেকে আলো
আনতে পারিনি। পোশাক খুলে নিয়ে চলে গেছে একটা মজার লোক।
আমার চোখে কি যে বুলিয়ে দিল সে। তারপর শুধু
চোদ্দদিন রোদে বৃষ্টিতে অন্ধকারে। নখ বেড়েছে। চুল দাড়ি
বেড়েছে। শুধু কমে গিয়েছিলো আলো। শুধু চারদিক থেকে
কমে গিয়েছিলো আলো। তারপর শুধু উত্তর থেকে দক্ষিণে
দক্ষিণ থেকে উত্তরে
অকস্মাৎ চোদ্দদিন পর দেখা হ'ল তার সঙ্গে।
সে আমায় আবার নিয়ে যাবে। সে আমাকে গরমজলে
চান করাবে। নখ চুল কাটাবে। লোকেদের সঙ্গে আমার
বুকের জরুল দেখিয়ে চিনিয়ে দেবে। আবার আমি কাঁদবো?
আবার ওষুধ খাবো? আবার গান হবে?
যাবো, আমি আবার যাবো, তবে শর্ত দে, জিজ্ঞেস করবি না
কোথায় ছিলাম এই চোদ্দদিন।

বাবুলালকে

কিছু না বোঝার আগেই আবার স্টেশন পেরিয়ে গেল।
এ-কথা বিশ্বাস যোগ্য মনে হয় না তোমার
কি করে যে ভুল হল—কি করে যে ভুল হয়—কি করে যে এত ঘোর
এত আলো ছায়া ঘিরে ঘিরে ধরে
এত কোলাহল ভেতরে ভেতরে—বিশ্বাস করাই কাকে।

হলুদ রঙের ভেতর কালো রঙে লেখা স্টেশনের নাম
আমি ঠিক পড়তে পারি না।
কেউ না বুঝুক, তুই অন্তত বুঝিস বাবুলাল।
তুই ওদের বোঝাস বাবুলাল।
আমি দিন ভোর চেষ্টা করেছি ওই স্টেশনে নামার।

আঁধার হয়ে এলো, বাবুলাল

বাবুলাল, আজ আমি উঠে দাঁড়াবো। আমায় তুই ধর।
বাবুলাল, আজ আমি স্টেশনে নামবো। আমায় তুই ধর।

সেতু পার হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছি ঝমঝম ঝমঝম
বাইরে সরে যাচ্ছে খেলার মাঠ, তাঁবু, জঙ্গল, ইটভাটা
চিমনির আলো।

স্টেশনে নামতে বলে সে আমায় ছেড়ে চলে গেছে আর বছর
ঘুরে গেল। সে কি অপেক্ষা করে আছে ওয়েটিং রুমে।
দেখতে দেখতে দিন কাটে। রাত হয়ে যায় কখন। রাত হয়ে যায়
রাত ভোর হয়। কেন আমার নামা হয় না বাবুলাল।
কেন স্টেশন খুঁজে পাই না।

বাবুলাল, আজ আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, আমায় তুই ধর।
জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে, তাঁবু আর খেলার মাঠের মধ্যে
আমি যে স্টেশন খুঁজে পাচ্ছি না, আমায় তুই ধর।

দিনলিপি

ভোর ॥ উঠোনে, যেখানে রাত্রির কুয়াশা আর বুগেনভিলিয়ার পাতা পড়ে থাকে সেখানে খুব ভোরে এসে দাঁড়ায় এক বোকা গাধা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে সেই চতুষ্পদ প্রাণীকে দেখি। কোথা থেকে এলি তুই।
আমি আর একটু শোব। কারখানায় যাবার দেরী দেরী আছে। কলে জল এলো—ভোর হচ্ছে—গাধারে—কি করি রে।

সকাল ॥ এখনো তুই দাঁড়িয়ে আছিস আমার প্রিয় চতুষ্পদ! আমার কিন্তু সময় হ'ল কাজে যাবার। ঘুমের রেশ জড়িয়ে আছে তবু তোর দুখের চোখের সামনে এসে দাঁড়াই। আমাকেই তুই ভয় পাস না শুধু। তোর গলার ওপর হাত রাখি কানে কানে বলি—জানিস, দুনিয়া জুড়ে আমার শুধু ভয়। কাউকে আমি ভয় দেখাই না এখন তুই যা লক্ষ্মীটি, কারখানায় যে বেজে উঠলো বাঁশি।

দুপুর ॥ চারঘন্টা মেশিন চালিয়েছি। এখন টিফিন। ক্যান্টিনের জানলার পাশে তুই এসে দাঁড়িয়েছিস। আমার মেশিন চালানোর শব্দ শুনলি তো। রোদ এসেছিলো। তীব্র সেই রোদ। এ্যাজবেস্টার্সের ছাউনি ভেদ করে রোদ আর রোদকে অগ্রাহ্য করে মনিবের কারখানায় এই আমার কাজ।

বিকেল ॥ কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরছি আমি। আমাকে ফেলে প্রথমে পালিয়েছিল আমার বাপ। বর্ষা হলে দুঃখ বাড়ে আমার। বিছানায় জল পড়ে। মেঘ ডাকলে কেঁপে উঠি। উঠোনে পিঁড়ি পেতে বরুণ দেবকে বলি, বোসো, বোসো। আমার ভয় করে। মাঠ ডুবলে জল আসবে আমার ঘর বরাবর। আমার উঠোনে জল আসবে—উনুনে জল ঢুকবে।
বেশ ছিলাম কাজের মধ্যে। এখন বাড়ী ফেরার পথে দুখের দিন মনে পড়ে। দুখের দিন মানে তো সাতকাহন। যেমন হতচ্ছাড়া রাত্রি।

ওহ্, ঘুমের মধ্যে কালপুরুষ। একটা একটা হাত পা খসে পড়ে। যদি ঘুম ভাঙে অন্ধকারে—বুজে থাকি চোখ। একবার এদিক একবার ওদিক। ঠাণ্ডা জল খাই। খুঁজি অন্ধকারের দিনগুলিকে। তারপর··· যাঃ, বাড়ী এসে গেল। আয় তোর সঙ্গে একটু গল্প করি।

রাত্রি॥ আমাকে দেখে নিতে হবে সব। যা ফেলে এলাম। আর যা করার জন্য অপেক্ষায় থাকবো। যুদ্ধ চলছে পশ্চিমের দেশে। রাষ্ট্রপ্রধান লুকিয়ে পালাচ্ছিল। দেশের লোক তাকে ধরে ফেলেছে। তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে সেনাদল। এসব গল্প তোকে বলে কি হবে। তুই বোকা গাধা। তুই ঘুমোতে যা। কত দুখের কথা শুনবি।

শোন, রাত্রি হ'ল। রাত্রি হলে ভাবনা হয় আমার। একলক্ষ পদ রচনা করতে হবে। কেউ শুনবে না সেসব। সময় কোথায় লোকের। সবাই খেত খামারে খাটে। সন্ধ্যেবেলা মদ খায় আর সস্তা আমোদ করে। আগুনের আঁচ নেয়। আমাকে একলক্ষ পদ রচনা করতে হবে—এই নির্দেশ।

দিনমান

সমস্ত সকাল গেল লোকালয়ে
সমস্ত দুপুর গেল মুক এক অশথের ছায়ায়
সমস্ত বিকেল শুধু গোধূলির সামান্য দূরেই

এরপর রাত্রি আসে বাতাসহীন, উটের যাত্রার মত

নাচ

কেউ নাচে।

বুক খুঁড়ে, মুচড়ে মুচড়ে কে নাচে
আমি সঠিক জানি না, বুঝতে পারি না।
নাচ চলে।
সারারাত ঘুঙুর বাজতে থাকে, ধীর লয়ে, দ্রুত লয়ে,
সারারাত আধো ঘুম আর জাগরণের ভিতর দিয়ে
আমি সেই নাচের শব্দ শুনি।

কেউ যেন সারারাত নেচে নেচে
আমায় জাগিয়ে রাখতে চায়
ঝড় ওঠে, রক্তে পাড় ভাঙ্গে মাঝরাতে।
কেউ নাচে।

সমস্ত অপমান
সমস্ত ব্যর্থতা মাঝরাতে বারবার আছড়ে পড়ে বুকে।

কেউ নাচে
কে নাচে, কে নাচায় খোলা চোখে
আমরা তার কিছুই বুঝে উঠতে পারি না।

সৈয়দ হাসমত জালাল

সংপূর্ণতা

আমি সেই জ্যোৎস্নার সাদা হাত দুটি যেমনি ধরেছি
আকাশের গায়ে ছিটকে উঠলো হলুদ আলোর কলঙ্ক
করাতকলের শব্দে টুকরো টুকরো হলো দীর্ঘ রাত্রির বালিয়াড়ি
শুধু ঝাউবন দুহাতে ঢাকলো মুখ 'ন,না…ন,না…'
ওরা জানে, নীল জলরেখাগুলি জানে, স্নিগ্ধ বাতাসেরা জানে
স্পর্শের ভেতরে কোনো আগুন ছিলো না

তবু আমাকে পুড়তে হলো, আমাদের সামাজিক দিন
কোলাহল তুলে পুড়ে পুড়ে ডুবে গেলো ছাইস্তূপে
জলের ভেতর থেকে উঠে এলো আমাদের সামাজিক রাত
নিমফুলঝরা রাত, হা-হা চৈত্রসমাজ
কে আমাকে চেনে, কে দেখেছে আমার মাংসমজ্জার নিচে
বন্ধনের কালশিটে আজও জেগে আছে, কে বলেছে প্রেতমুক্তির কথা

মৃত্যুর সম্মোহ ছাড়া আর কিছু আমাকে টানে না
আয়ুধবিহীন অসূয়াবিহীন আমি সমাজের কাঁটাতার ছিঁড়ে
একা সমুদ্রে চলেছি, কাউকে ডাকিনি
দূরে সরে গেছে জল, জ্যোৎস্নায় সাঁতার কাটছে ভেজা মরুমাটি
আর পাথরপাঞ্জর আমাকে টানলো সবলে
গানের ঝলকে গভীর রক্তের স্রোত উঠে এলো
শরীরে বন্ধনের দাগ মুছে দিতে, দুগালে নুনের রেখা মুছে দিতে
উড়ে এলো রক্তজবার ছেঁড়াখোঁড়া পাপড়িরা
কাপাসের বীজ ফেটে উড়ে এলো তুলো, রক্তবর্ণ ভালোবাসি ব'লে
পাথরের সিঁড়িতে তারা এঁকে দিলো লাল রাত্রিমেঘের
ফোঁটা ফোঁটা আলপনা

আমি আর জাগতে পারছি না রাত, দুচোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে

দিগন্তরেখা, আমাকে ডাকছো কেন, পাথর বিছিয়ে দিয়েছে আমার শান্তিশয্যা
ঝাউবন, কারা এতো বিহ্বল স্বরে কথা বলে চারপাশে
মরুজল, ছলাৎ ছলাৎ ছন্দে এই রাত্রির অতীত কোন্ পাখিদের
ডানার শব্দ উড়িয়ে আনছো তুমি…
কে তুমি আমার কপালে রেখেছো নিষ্কলঙ্ক হাত
রক্তক্ষরিত জীবনে রেখেছো মায়াময় মানবিক হাত
আজ কি আমার জন্মদিন, আজ বুঝি তোমার জন্মদিন
জলের ওপার থেকে চাঁদের ওপার থেকে ভেসে এসে
আমাকে মৃত্যুর গৌরব চেনাতে এসেছে

এই শেষ স্মরণযোগ্যতা নিয়ে আমার দুচোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে
জন্মের রূঢ় সংসংপূর্ণতা নিয়ে আমার দুচোখ ভরে উঠছে ঘুমে

চন্দ্রমা

মাঠের ঠিক মধ্যিখানে ফুটে ওঠে মা ;
আমাদের শান্তিজল ; ধারাবিগলিত।
মায়ের মাথার ভিতর মশারী টাঙানো ;
শিশু সব—লক্ষ্মীমন্ত, পয়মন্ত। ঘুম করে।
ঘুমের ভিতর নির্জন, তমসা, সেই গভীর চাঁদ ওঠে।
গাছেদের তলে তলে চাঁদ পড়ে আছে। কুড়োতে যাই।
আমরা সবাই মিলে কুড়োতে যাই ;

শতশতাব্দী

প্রসবমাতা ; দরিদ্রের অন্নপূর্ণা একটি গৃহ গড়েছে।
দূরে মাঠ শুয়ে আছে। মাঠের ঘাস ও শিকড়।
এই প্রথম আনন্দ। মাঠের সহিত মিশে আছে ঘুম,
ঘুমের শূন্যতা ; ঘুমকে কৃষিক্ষেত্র ভেবে
ধান রোপন। ফুটে উঠলো সবুজ একটি শিশু।
হাসি ধরতে ছুটে এলো কৃষ্ণপক্ষের মাঝি।
জলের উপর শব্দহীন দাঁড়। নৌকোয় শতশতাব্দীর সুর

অসুখের সময়

এইরূপ রক্তাক্ত সন্ধেবেলা ঘরের পাশে পথভ্রষ্ট বাতাসেরা
কেঁদে-কেঁদে ঘুরে যায় বিহ্বল বিড়ালের মতো
এইরূপ হলুদ সন্ধ্যায় রমণীর ব্রহ্মাঙ্গ থেকে
উঠে আসে স্থির মনীষার ঘ্রাণ
অনন্ত জ্যোৎস্নায় বুকের মধ্যে দুলে ওঠে শূন্য বারান্দা
লালবাড়ির ভিতর লুঠ হয়ে যায় কুমারীর পবিত্রতা
পুলিশ-প্রহরায়…

এইরকম ঋতুহীন দিনে মেঘবর্ণ নিঃসঙ্গতা নিয়ে
অসুস্থ জলপ্রপাতের সঙ্গে বিনিময় করে নিই প্রবল বন্ধুতা
উচ্ছ্বিত শরীরের গূঢ় স্বাদ নিতে ছুটে আসে বিষাক্ত মাছি
টেবিলের উপর কবিতার কাটা-প্রুফ মাধবীর শেষ চিঠি
বইপত্রের নিস্বাদ জঞ্জাল এবং দৈনন্দিন আত্মনাশ
খুব বেশি অর্থহীন মনে হয়…

এ-রকম বিধুর সন্ধ্যায় পৃথিবীর যাবতীয় ফুলের বাগান
দু-পায়ে তছনছ করে
মাংসবিক্রেতা-সমীপে নতজানু হতে পারি
পরুষ আঙুলে ছুঁয়ে যেতে পারি
রঙিন ঘাগরার অন্তর্গত তীব্র হলাহল
এইরকম ভয়ংকর জ্যোৎস্নায় সোনামুখী মেয়েদের
কুচিকুচি করে দেখা যেতে পারে কান্নার একান্ত শিল্প
এইরকম অস্থির সন্ধেবেলা আঙুলে সিগারেটের অন্তিম স্পর্শ
টের পেয়ে নিজের কাছে ফিরে আসি পুনর্বার…

আর তখন, ঠিক তখনই, পাথরপ্রতিমার সম্মুখে
নতজানু হয়ে উচ্চারণ করা যায় সেই অকূল মন্ত্র :
ক্ষমা করো ক্ষমা করো ক্ষমা…

মল্লিকা সেনগুপ্ত

গ্রীষ্মচিত্র

ভেজা সোরাপাত্রে হাঁড়ি, তার মধ্যে শীতল বীয়ার
কালোতনু মেয়েটিকে জাপটে জড়িয়ে শাদাভূত
গলায় পানীয় ঢালে। কালোদাস পাংখাচালক
ঘরের বাইরে বসে দাঁড় টানে, ঘামে জবজবে।

আঠের শতক, ভেজা খসখস তখনো আসেনি,
আসেনি জাহাজে করে টনটন রূপোলী বরফ
পরীর মতন মেম নগ্নগায়ে মোমরঙ মেখে
ঝাঁপ দিল চৌবাচ্চার জলে, তবু শান্ত থাকে জল।

পরনে ব্রিচেস, টুপি, কৃষ্ণচূড়া টুপির ওপরে
সাহেব ঘুমিয়ে পড়ে আরামচেয়ারে।
'ম্যাগো, রকম দেখো না মিনসের'—বলে
পিচ করে থুতু ফেলে দৌড়ে পালায়
তার বুক থেকে উঠে শ্যামলী মেয়েটি।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

পথ

রাত বারোটায় দেবগায়কের মত গান ধরলেন তিনি। দরবারী কানাড়ার
সুরে প্রথমে পার্কের ছোট গাছপালা পরে পথ অমরতা পেল।
রক্তে ভিজেছিল পথ, রুদ্ধ বারুদে পথ নখ ঘষেছিল একদিন—
শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার মনে পড়ে, আমরা দু-জনে তাকে খুব
ভালোবাসা দিতে চেয়েছিলাম! তারপর রাত্রি এলো। শীতকাতরতা
এলো। গান এলো। আর পথ, সুরোন্মত্ত পথ ঠিক আমাদের
মাঝখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে, হেঁটে হেঁটে চলে গেল, চিনল না

কালীপদ কোঙার

হতাশা

সংসারের অতলান্তিকে
প্লেনটা পড়েছে ভেঙে
আরোহী কবির আর্তনাদ
কবিতার ব্ল্যাক বক্সে ধরা আছে।

গবেষক বলছেন
কবি হতাশা কেন,
কবি কেন পাঠককে
দেখাচ্ছেন না আলোকের দিশা।

দীপক লাহিড়ী

বাড়ে রাত্রি বৃত্ত তমসায়

জবাগাছ একলা সমুদ্র দেখে—যখন পালায়, ঢেউ ঢেউ
তটরেখা থেকে ; আমেজে দিন ভাসে কলহাস্য উৎসবমুখর ;
ব্যাপ্তিতে পাহারা নেই শুধু উড়ে যাওয়া—ঝরাপাতা হ'য়ে…
মালিন্য দূরে যাক দূরে থেকে আরও দূরে অস্পষ্ট সীমারেখা পার হ'য়ে
ফোটাফুলে গানের উচ্ছ্বাস, ঝাউবীথি তুমুল চাঁদ
পার করো উপবাসী রেখা-নদী, মায়াজাল ছড়ানো উপল
নির্বাপিত হোক অগ্নি, প্রেম, গৃহস্থের ঘর—ওই ঢাল ঘাতক বুঝেছে
চৈতালি হাওয়ার বুকে সঁপে দিলে রক্তের চুমো
অভিমানে ছুটছো পাথরে—যা কিছু প্রাপণীয় নয়
তাকেই নিবিড়তর ভেবে ভেঙে প'ড়ছো নোনা জলের পাশে
এবার ওড়ো দেখি দিক্‌চক্রবালে—জলজ কান্নায় ভাঙে শেষের প্রহর

রাত্রি যায় বাড়ে রাত্রি, বৃত্ত তমসায় বড়ো অনুভূতি ধ'রে

চিত্রা লাহিড়ী

অপযশে উচ্ছেদ উৎসব

ছলনায় ফিরে এলে কেমনে এড়াবো বলো উচ্ছেদ উৎসব
কেমনে ছড়াবো বলো পদ্মবীজ আচমা জমিতে
আমি মন্ত্রপূত আঁশবস্ত্রে কুমুদ বেঁধেছি
চাবিকাঠি লুকিয়েছি কাকচঞ্চুপুটে
এক অপযশ—অহো কী অপযশ
কুলিন ভাণ্ড পোড়ে গৃহমণি আঁচে
বাঁচতে দেবে না জানি বাঁচাতেও না
ভ্রূলতা ভঙ্গি ভাঙে দামিনী চমক
ওহে ক্ষতযোনি কিংকনি যদি পারো
তত্ত্বতল্লাস সারো গোপনে গোপনে
নইলে তামাদি হবে আনন্দ আবেগ।

মনে আছে (দুই)

বেশ মনে আছে, আমাদের উঠোনে এক ল্যাব্রাডর স্রোত বয়ে যেতো।
তারই দুপাশে জেলেরা আসতো মাছ ধরতে
তাদের পরনে ডিঙি নৌকো, চৌকো সমুদ্রের জাল।

আমাদের মঙ্গলা গাই, সন্ধেয় বাড়ী এসে হাম্বারব করতো
দরজা খুলে দিলে সটান গোয়ালে ঢুকে গায়ে জড়াতো শাল,
তখন শীতকাল।

আমাদের উঠোনে রুই কাতলা শোল থেকে সামান্য পুঁটিও
চিতলের রূপ ধরে ঘাই মারতো, টান
আমরা গান ধরতাম : যেদিন সুনীল জলধি হইতে···, ডি এল রায়ের

তখুনি বাবা মাকে শায়ের শোনাতো, রাত
আমি পাশে-শোওয়া বোনের কান আলতো কামড়ে বলতাম : শুনছিস ?
ও আমার ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে বলতো : চুপ।

বোনগুলোই বা কী? আমরা সাত সকালে উঠে কোঁচড়ে ফুল তুলতাম।
ফুলগুলোও বলতো : চুপ। ফুলগুলোই বা কী—ক্লীব?
তখুনি দরোজায় ছায়া, সেলাম আলেকুম, বাচ্চে সব।
দেখি স্বয়ং মীর্জা গালীব!

কেন অন্তঃপুর

প্রথমা

আলোমুঠি
ফেটে গেল শরীরের কোষে কোষে
রক্তকণিকায় ;
চক্ষুহীন, মেধাহীন রমণী শরীর
সীমাহীন নিবেদনে চূর্ণ হ'য়ে গেছে।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে ;
বীর্য আর গর্ভরক্ত ছেনে
এতটুকু আলো নিয়ে আসেনি সে ;
একমাত্র উত্তরাধিকার অন্ধকার
মেঘের মতন ছায় এখানে আকাশে।

দ্বিতীয়া

জলস্তম্ভ কালো জল ফুঁড়ে আছড়ে পড়ে,
তছনছ্ ক'রে দেয়
শান্ত নিরুদ্বেগ দিন ;
তেমনি অশান্ত তেজ
ভীরু বিধবার শুদ্ধ জীবনযাপন
ভেঙে দিয়ে গেছে একরাতে।

আহিতাগ্নি ঋষি,
নিষ্কম্প দাহিকা শক্তি মেধা ও জ্ঞানের,
পুড়ে যেতে চেয়েছে শরীর,
তবু ভয়,
পবিত্র যজ্ঞের কাঠ ঘেমে ওঠে

আগুন এমন কঠিন
মৃত্যু এত কঠিন পরীক্ষা।
মানি, ভয় ছিল,
বিষম মিলনরাতে দ্বৈরথ প্রেমের দ্বন্দ্বে
পূর্ণ পরাজয়
তাই আজ বিকৃত গর্ভের বীজ
নীরক্ত পাণ্ডুর,
শৃঙ্গারলোলুপ মূঢ়,
বংশরক্ষা অপারগ ভীরু পাণ্ডু

তৃতীয়া

তোমাকে দিইনি কিছু;
সমগ্র অন্তর দিয়ে
প্রতি রক্তকণা, প্রতি রোমকূপ দিয়ে
একাগ্র পূজার পরে আশীর্বাদী উত্তালের মতো
নিয়েছি তোমাকে।

তেজঃপুঞ্জ, দাসী আমি।
তেজের মহিমা আমার বোধের অতীত।
ধার্মিক বিদুর আমার গর্ভের ফল;
দাসীর ঔরসে
ব্রহ্মতেজ ভস্মে ঢাকে,
ন্যায়ভীরু সামান্য বিদুর
আগুনের দীপ্তি কোথা পাবে?

সমস্বরে

হেরে গেছি,
রাজকন্যা থেকে দাসী
সম্পূর্ণ মানবাশিশু আনিনি আলোয়।
রক্তাক্ত গর্ভের কাঁটা
ছড়িয়েছে বন্ধ্যা মাটি ভ'রে
রক্তবীজ কাঁটাগাছ মরুভূমি ছেয়ে।

যে কলঙ্ক আমাদের মুখে,
সে কালিতে লেপে গেছে গোটা দেশ;
জুয়াবাজ ধর্মধ্বজ আর ন্যায়হীন ক্ষমতালোভীর
রিক্ত দ্বন্দ্বে
শ্মশানপ্রান্তরে শুধু শিয়ালের রব।

আজ যদি প্রশ্ন করি সব নারী,
পুরুষের যোগ্য কেন নারী নেই?
কেন অন্তঃপুরে থাকি ইঁটচাপা ঘাস?
কেন মেধাহীন, বুদ্ধিহীন শরীরযন্ত্রের ব্যবহার
ঘন অপমানে
কি করেছো পুরুষের দল?
প্রেমরিক্ত শরীর-সঙ্গম
অসহায় আজ্ঞাবাদী দাসীদের সাথে,
একমাত্র লক্ষ্য বংশরক্ষা।

যতখানি দিতে পারি
সবটুকু নিংড়ে নেবে এমন পুরুষ কই?
কে খুঁজেছে গহন শক্তির উৎসমুখ?
নিষেধের মুঠি
পিষে ফেলে অন্তরসম্পদ
সূর্যহীন ঘোর দিনে

কুঁড়িতে শুকোয় সূর্যমুখী

পুরুষ জানেনা প্রেম, এত অন্ধ,
পুরুষ জানে না নারী, এত মোহ।
অর্ধমানবীর গর্ভে অর্ধমানবের বীজ
আদ্ধেক মানুষ গড়ে;
কেউ অন্ধ, কেউ লোভী, বীর্যহীন,
কেউ ভীরু ধর্মচারী দাস।

অতৃপ্ত রমণী
স্বপ্নে গড়ি সম্পূর্ণ মানুষ

শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

জল রং

অশথের মরা ডাল, তাতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে ডেঁয়ো পিঁপড়েরা। ছুটির দিন। ভোর হল। জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে ওই তো হেঁটে আসছে অন্ধফুলওয়ালি। ওর কাছে যাবো। ওর হাত থেকে ফুলের গন্ধ চিনে নিতে চাই। কতদিন পরে যে আবার খেজুর রসের মত উপচে পড়ছে এমন রোদ্দুর, শীত এসে গেল। হলুদ হলুদ পাতাগুলো বিছিয়ে আছে উঠোনে গমের বস্তা ফুঁটো করে পালাল যে কটা ইঁদুর, যাক যাক আজ ছুটি। খবরের কাগজ গটমট করে এল বিছানার কাছে থ্যাঁতলানো ঘুম চোখে হাই তুলছে কেউ। ছড়িয়ে যাচ্ছে জলচুমকিগুলো, দ্যাখো, স্বার্থপর দৈত্য এবার ভেঙে দিয়েছে তার বাগানের পাঁচিল। দ্যাখো, ব্যাটবল হাতে ধুমধারাক্কা নেমে আসছে এ পাড়ার ও পাড়ার ছেলেরা। কচ্ছপের পিঠে পা রেখে ঘুরতে বেরিয়েছে এই সকাল। আর লাল সবুজ পাখি উড়ে উড়ে এসে বসছে তার মাথায় কাঁধে

শুকতারা রায়

আমার পৃথিবী

তোমাকে লুকিয়ে রাখার এক কুনকেও জায়গা নেই
তাই আমি একা একাই ঘুরে বেড়াই এ-দেশ সে-দেশ।
মাথার ওপর এক মহাফাঁকি জেঁকে বসে
পায়ে পায়ে অস্থির ঢেউএর অবিরাম ঠেলা।
জীবনের ঝুটঝামেলাগুলো মরে যায় একটু
তবে শিমুল তুলোর মতো উড়ে যায় না।
বেতুলার পথে পলাশের বনে আগুন
আমার পৃথিবী ছোট এক অপেক্ষাঘর॥

ভ্রমণ

আমরা ছুটে চলেছিলাম হালিশহরে
পথের দুপাশে শুধু সবুজ গ্রামের রূপ,
আমাদের ঘিরে টাটকা লেবুর সজীবতা,
এই ভ্রমণ কি শুধু এক সুন্দর স্মৃতি?
খানিকবাদেই জানি আমাদের ফেরার
পালা কিন্তু না ফিরি যদি আর?
এমন কোলন সেমিকোলনে না বেঁড়িয়ে

যদি চলে টানা এক 'চরৈবেতি'?
যদি থেকে যাই স্বেচ্ছা নির্বাসনে?

জলরঙের কাঁপা কাঁপা তুলির টান

প্রথম দেখার সময় বসেছিলে
মুখোমুখি চলতি পথের দেখা
তুমি বৃষ্টির চিকের ওপারে।
জলরঙের কাঁপা কাঁপা তুলির
টান। কাছে তবুও বহুদূরে।
না—বহুদিনের পরিচয়
চিকণ বাঁশের ঝালর থেকে
এলে হঠাৎ। সাপলুডোর
বাঁকা ছকে কতোটা কাছে
এবার ?

খোকন বসু

বেথুয়াডহরি

কাল থেকে ঘাসে ঘাসে পা ফেলে দাঁড়িয়ে আছে রোদ্দুর, কস্তুরীভূত
হরিণের নাভি চেটে দিচ্ছে বেথুয়াডহরি, এসো ডালপালা আঁকাবাঁকা
হরিণের শিঙ, তার মাথার ওপর উঠেছে পরিপূর্ণ চাঁদের গোলক—
এই মৃগনাভি নেমে যায় আরো নিচে, তার মমির মতো গন্ধ
ঘাস আর ঘাস ছাপিয়ে ওঠে, শীতের কমলালেবুর সাথে জমে ওঠে
মৃগদাব, কে আছো, দাঁড়াও, পথ জুড়ে নেমেছে দাঁতাল
কৃষ্ণসার ছায়ার দুপাশ ধরে শুধু সন্নিপাত পাতা ঝরে যায়—

শ্যামলজিৎ সাহা

শান্ত সমাধান

লাল-রঙা আমপাতা, আশ্চর্য পলাশ
দেখে বাইরে এসেছি। আমরা আগুন
নিয়ে বেঁচে আছি ভেবে প্রতীক-আনন্দে
নিজেদের দগ্ধ করি। বেঁচে থাকে ভয়।
সবার জীবন কেন রক্ত-পলাশের
আয়ু নিয়ে ব্যর্থ হয়! যে হৃদয় স্বচ্ছ,
তাকে ছায়া দিই, ছায়া বাড়ে রুগ্ন দেহে।

এ জীবন আরো অনেক মৃত্যুকে টেনে
আনতে চেয়েছে। অন্ধকার মুছে গেছে
দিনে-দিনে বহু ঘুমে, শান্ত সমাধানে।
বিবশ শরীর ঠেলে বাইরে এসেছে
যে সকল যুদ্ধ, তাও ঠাণ্ডা হয়, অস্ত্র
সব ঘাড় ভেঙে দেখি খসে-খসে যায়।

প্রকৃতি আশ্রয় ক'রে যে সবুজ ঘাতক
সবার ভেতরে ঢুকে যেতে চায়, তাকে সঙ্গে
নিই, বৃষ্টি এলে ধুয়ে যাবে ধুলো-চিহ্ন—
আর একবার তুমি ভাসিয়ে তুলবে
তোমার ভেতর। ভাঙতে থাকবে ভার,
টেনে নেবে ভিজে লাল-রঙা আমপাতা,
আগুন-পলাশ…

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

অন্য রীতি

বাইরে-দূরে হরেক রঙের আলোর ঝিলিক
লাগছে ভালই এই অসময়, অন্ধকারে
ও ভোলামন তুই তো আছিস সেইটুকুতেই
বেঁধে নেবার সাহস পেলাম জীবনটারে।

মধ্যে-মাঝে বিষণ্ণতার নৌকো বেয়ে
একলা নাবিক যায় হারিয়ে স্মৃতির দোরে
সত্যি আমার সে এক সুখের দিন ছিল ভাই
গল্প দীনের করবো শুরু নতুন করে?

বরং না থাক, এ যা আছি সুখেই বাঁচি
এই বাঁচারই অন্য আর এক অর্থ আছে॥

নৃসিংহ মুরারি দে

গাড়ির টায়ার

ভিখারীর বাচ্চা হাত পেতে আছে
সেই হাতের ওপর দিয়ে চলে গেল
আধুনিক রাজার গাড়ির টায়ার
পরদিন খবরের কাগজের হেডিংয়ে
আমরা জানতে পারলাম
এ যুগের সবচেয়ে বড় উপহার
গাড়ির টায়ার

জয়ন্তী রায়

শেষ রাতে

শামুকের খোলের ওপর
সাজিয়েছো ঝাড়বাতি,
তারও ওপারে বাড়ি
দরজায় সাজানো খিলান—
কাকে আজ ডেকে নেবে ঘরে,
পাহারায় থেকে থেকে
চৌকিদার নিবিয়েছে আলো,
আচ্ছন্ন হ'য়েছে ঘুমে তৃতীয় প্রহরে,
আকাশের তারারাও ঘুমিয়ে পড়েছে,
প্রভুভক্ত কুকুরেরা চলে গেছে
ওপাড়ার ডাকে।
বৈঁচিগ্রাম থেকে যারা এসেছিলো
তাদের কথার স্বর
নতুন চমক দিয়ে গেছে—
চলে গেছে শেষ ট্রেন স্টেশনের বন্ধুত্ব ছাড়িয়ে,
এখনও কি তুমি বসে আছ
শেষরাতে মালিনীর ঘরে যাবে বলে?

অহনা বিশ্বাস

প্রাকৃতকথন

তবু প্রাকৃতকথন বলি শোন
বলি মূঢ় রাত্রির কথা
বীজবপনের শব্দে জেগে ওঠে রাত্রিবর্গ
জেগে ওঠে আত্মীয়স্বজন, নগরবাজার
সভাময় সবুজ ঘাসেরা অসুখবর্ণের কথা বলে
আমি তো ডাইনি মেয়ে নই, কৃষ্ণভজনা যদিও করিনি কখনো
তবু তো এসব স্তোকবাক্য, মিথ্যে শ্লোক মাত্র নয়
আমার শরীর জুড়ে খেজুর বাবলা
আর উটের বিখ্যাত কুঁজ ঘিরে সারাক্ষণ স্বপ্নময় মরুদ্যান

তুমি তো এসব জানো
তুমি তো চন্দনবীজের মমতা মানো
হিমেলরাত্রিতে তাই মন্ত্র জাগে, ও কি গল্প বল তুমি
গাল বেয়ে রক্তকষ নামে, সারারাত ধরে লজ্জা পাই
আর শ্রেণীগোত্র ভুলে শ্মশান বালিতে লুটোপুটি খাই

ভাগ্য দেখো, দেখো ভাগ্য, কীকরে প্রণাম করি
কী করে খনন করি বলোতো নিজস্ব মাটি, বলো বলো
আর পথে যদি পড়ে তোমার দোকান
আমি কী কিনতে গিয়ে কী ভেবে আবার ফিরে আসি
এই তো সচল জমি পা ফেলতেই মুখ থুবড়ে পড়ে মরি

বন্ধুরা বাগান করে থাকে
আর তার ফুল দিয়ে ঢেকে দেয় আমাদের মৃত্যু
আজ তারা একরঙা কাঁড়িগান পরে ঘোরে
কাল তারা শহরে শিমুল চেনে ভিন্ন পথ ধরে
আমি যে মায়ের চুলে শোক মুছি,
বন্যাজলে কান্না ধুই, একা ভেসে যাই দূরে, গ্রামান্তরে

তারপর কোনদিন এক প্রতিপদ তিথি এলে শিরীষ ছায়ায়
মাঠ যদি রাজি থাকে ক্লান্তিভার নিতে
মেঘ যদি রাজি থাকে আর শরীরে বিদ্যুৎ নেমে আসে
তখন কিইবা করার থাকে বলো
আমি শুধু কাকভোরে স্নান সেরে একা
প্রাকৃতকথন বলে ফিরি জনে জনে

অরুণাংশু ভট্টাচার্য

মা-কে

এও আমি তোমাকে দিলাম, হেসো না সঙ্গীতা
তুমি যদি না নিতে পারতে এ আমি ফেলেই দিতাম।

আগুনের কাছ থেকে কতো দূরে তুমি বসে আছো
অথচ আগুন শিখা আগুন কাঠ আগুন গালে আগুন—
যদি তুমি কিছু না বলো (বলা কি খুবই জরুরি ?)
তবে আমার প্রিয় শ্যামাসঙ্গীতটি তোমাকে শোনাই
আর তুমি অত্যন্ত আদরে তোমার গর্ভমুকুলটি মেলে রাখো

অপ্রস্তুত

অল্প টুংটাং শব্দে বেজে ওঠে বেল
রাত বারোটার পরে বাড়ি ফেরে রেহানার মেয়ে
গোলাপি রেশম ঢাকা তার বুক
সপ্তদশী অনিন্দ্য শরীর
কিছুটা হেলিয়ে পাশে বসে,—'এ কি হাতে কিছু নেই কেন?
কী খাবেন পোর্ট না শ্যাম্পেন? কী ব্যাপার
মনে নেই আমাকে—নানির বাড়িতে এলেন, সে বছর
করাচিতে, কত গল্প হল, হাসি-ঠাট্টা।'
হায় আমার কী দোষ! সেদিনের আট বছরের শিশু মেয়ে
এত পাল্টে যায়,—তার শরীরের খাঁজে আজ লেগে থাকে
বয়স্য বাসনার ভঙ্গি। লাস্যময়
সহসা উচ্ছল হয়ে হেসে ওঠে রেহানার মেয়ে।

আমি আরও একটু অপ্রস্তুত হই।

মনোভূমি

আকাশ ভেঙে নেমে আসছে হাওয়া
উড়ে যাচ্ছে রোগা মেয়ের অনভ্যস্ত আঁচল
আকাশ ভেঙে নেমে আসছে হাওয়া
স্কুল-ফেরত শিশুদের হাত ধরে শহরতলীর নরম মায়েরা
বাড়ি ফিরছে
শেষ বিকেলের আলোয়
একাকার হয়ে যাচ্ছে স্বদেশ, বিদেশ, জন্ম-পিতৃভূমি।

তোমার কথা

মায়ের কাছে রেখে দিয়েছি
আমার মুখের কথা—
ঠাণ্ডার ধাত-জামার বোতাম-দুপুরের চুরি করা আচার।

ঋণ আমার জমা আছে বাবার কাছে
গাঢ় ধূসর চোখে তিনি আমায় শিখিয়েছেন,
পৃথিবীর পাহাড়ের কথা।

তাই, তারা জানে,
আমার প্রথম সিগারেট, হাঁটু ভাঙা বিকেলের
মুখ থাসে জমে থাকা চাপ চাপ রক্ত।

মনে পড়ে, বর্ষার দুপুর
অনেকটা সন্ধ্যের মোতো হয়ে এসেছে,
শুনতে পাই তুমি ফিসফিস করে বোলছো—
বৃষ্টি থামবে না, এতো আকাশ
থেকে পড়ছে না।

আমি তোমার মুখ খুঁজে পাই না
দেবদারু পাতায় আমাদের বৃষ্টি থর থর করে কাঁপে
শব্দের-স্মৃতির-বৃষ্টির ভেতর
আমি তোমায় রেখে দিয়েছি।

অমলেন্দু বিশ্বাস

মাইল ষাট

মাইল ষাট দূরের থেকে ডাকো ?
কেননা আমি যাই দুপুরে ছুটি
বৃষ্টিভেজা রৌদ্রদাহ বুকে
তোমার দিকে শহর পথে হাঁটি…

কীসের ডাক ? ছুটতে হবে আজো !
বোঝার আগে হৃৎদরিয়া ভাসে
মনবাতাসী সীমানা ভেঙে ধায় ;
আগুন তুই তাহলে কেন মাঝে
পুড়িয়ে দিয়ে উড়বি শ্বাসে শ্বাসে।

দমবন্ধ করেই দেখি আহা !
নয়ন দু'টো নয়ন পেলে ধরে ;
চার নয়নে দৈবাৎ হয় দেখা
মাইল ষাট শূন্য হয়ে ফেরে—

তাপস রায়

মরণ জল

মরণজল ডোবায় জেনো
পুরুষ যদি হয়

ওই নারীটির মধ্যে দেখি
আমার বিস্ময়

ওই নারীটির গর্ভে জল
জাগায় শুধু ফাগুন

মরণজল অথৈ হল
পুরুষবীর্যে আগুন।

ধীমান চক্রবর্তী

মানুষ—৫

এই ভোরে সে জড়িয়ে নিয়েছে
মৃত অন্ধকার থেকে ছিটকে আসা সাদা তারের ফাঁদ।
সারারাত বাদুড়দের সঙ্গে সে কথা বলেছে,
কিছু কিছু হয়তো তার মনে আছে।
মাঝে মধ্যে শিস দিচ্ছে,
মুখের উপর ফুটে উঠছে হাসির জলাশয় ও
উপত্যকা।
এগিয়ে যাচ্ছে ওই জলের দিকে,
যে জলাশয়রা ক্রমশ কুয়াশার দিকে চলে গেছে।

সে খালি ভাবে, এ আমি কোথায় এলাম
যে কাটা মুণ্ডুরা কেঁপে কেঁপে
স্তোত্র পাঠ ক'রে চলেছে।

গাছেরা তার শরীর থেকে ফেলে দিচ্ছে সাদা জাল।
হাড়ের উপর তবে কেন চেপে বসছে এই
নতুন সবুজ শেকল ?
জলের ভিতর আমরা বসবাস ক'রছি বহুকাল,
বারবার ছুঁতে চেয়েছি তরলের শরীরে ভেসে থাকা
খস্‌খসে আকাশের নীল চামড়া।

সে এলো, জলাশয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলো।
ধীরে ধীরে, ঘুরে দাঁড়িয়ে জল থেকে দূরে চলে গেল।
আমরা জানতেও পারলাম না,—
কেন সে এসেছিল এবং
ওই জলে স্নান না ক'রেই ফিরে গেল।
তার সাথে হেঁটে গেল যাবতীয় জল ও চামড়া।

অভীক মজুমদার

পরিচয়

আমার আকাশ মানে গোটাদেশ ছেঁড়াফাটা রূপকথা, কোনো
পুরনো বন্ধুর কাছে ফিরে যাওয়া বছর পেরিয়ে তার
মুখ ছুঁয়ে দেখা

সে এক পুরনো বন্ধু শুদ্ধমতি, হাতে শালিধান
কিছুই পোষে নি দুঃখ কেবল মাটির খেলনা ছাড়া
সেও কোনো রক্তপাত দুচোখে দেখেনি, মোড়ে বেহালাবাদক বলল
'নাগরিকে আমিই ছিলাম'

আসলে পাল্টায় শুধু সবুজ খুপরি লন
ঘের-গ্রিল মেয়েদের ছাঁট কাট জামার বোতাম
বন্ধুরা পাল্টায় বুঝি? পকেটে চিপকে চূর্ণ বাবলগামের আঠা
শিরদাঁড়া বেয়ে বেয়ে আকাশের নীলতর মোম

জলীয়তা ঝরো শেষ বুক আর মুখটুকু মুছে দাও
আরো কোনো অচেনা বৃষ্টির মত কে ওখানে
আমি নয় আমি বা আমার চেয়ে উঁচু ছাদে আঁকাবাঁকা দেশ

আমার আকাশ মানে অক্ষরের অন্য জলপথ
বেয়ে ফেরা

'চর্যাগীতির ভূমিকা'

এখানে আগুন আর মানুষের মাঝখানে পড়ে আছে চিলতে দুপুর
জল বৃত্ত; ফের ওঠানামা, ফের বৃত্ত ফের অসমবিস্তার
তাহলে মানুষ পাবে মানুষের সবটুকু মুখ, শহর নিজের মত হবে?

শিল্পটিলা থেকে কোনো নিঃঝুম মাঝরাতে সরে আসে গানের আওয়াজ
রিপভ্যান উইংকল শিস্ দিয়ে ঢুকে যায় পলকা বাড়ির মধ্যে

মেট্রো-ট্রেনের শব্দ;
আর কেউ নাটক দেখেছে, বহুরূপী প্রযোজনা
শেষ দৃশ্য ভাবতে ভাবতে ফিরে আসছে একা
সব ঘর দোর আর ঘর দোর জলের মতন ঘুরছে
বৃত্ত: ফের ওঠানামা, ফের বৃত্ত অসমবিস্তার

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঁচঘর

দেখ, এই ঘরে কাঁচের শো-কেস, জানলার পাল্লা,
টেবিলে পেপারওয়েট, দেয়ালে টিউবলাইট—
শতাধিক কাঁচের টুকরোয় ভরা
এই ঘর, এর উপাদান
আরো কত টুকরো হয়ে যেতে পারে
হয়ে যায়—

সবে কাঁচ ভেঙে ফেলে
একবার এর প্রাণে হাত স্পর্শ করো,
বুঝে নাও—
আবরণের ভেতরে থাকে প্রকৃত সুন্দর।

গৌতম হাজরা

কলকাতা, পুড়ে যাচ্ছি বলে

দারুণ দহন জ্বালা। জল দাও কলকাতা, পুড়ে যাচ্ছি বলে।
পুড়ে যাচ্ছে ভালোবাসা ঐ ঋণ ঐ ছন্দ তুমি কি পাথর?
তবে কেন রেখেছিলে তীব্র স্রোত কাঙ্ক্ষিত দু'চোখের শর
দারুণ দহন জ্বালা জল দাও তরঙ্গমালা কোথায় লুকালে!

বাইরে পাখির গান, গাছেতে শীতের ফুল, ঘাসের সবুজে
কেমন করে থাকি বলো হে সুন্দরী জন্ম জন্ম দু'চোখ বুজে?
বুকের দান দিয়েছ বানিয়েছ আকাশচুম্বী অট্টালিকা
যান জট মিছিল মিটিং তীব্র কষ আগুনের শিখা।
তবু দেখ আঙুলে রক্ত ভেসে যায় দূষণ ভাগীরথী
তুমি কি আমার নও, মোহমুক্তির তুমি কি নও সতী!

দারুণ দহণ জ্বালা। জল দাও কলকাতা, তিলোত্তমা তুমি
পাঁজরে পাঁজর ফাটুক দ্বিতীয় সেতু মাতাও এ বঙ্গ ভূমি
শিউলির গন্ধ মাখো মেট্রো রেল নতুন নতুন প্রজন্ম
হে অগ্নি, হে তেজ হে কলকাতা তোমাকে নমি নমোঃ নমোঃ
তবু দেখ জঠরে জ্বালা ক্ষুণ্ণবৃত্তি ফুটপাত উথাল পাথালে
নিমজরে থরথরো বড় তেষ্টা কলকাতা, পুড়ে যাচ্ছি বলে!

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

হয়তো আমরাও আগুন হয়ে গেলাম

পনেরো বছর বয়সে তাকে বলেছিলাম
আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি
সময় হলেই এসো
তখন অন্ধকারে তারার মত তার নীল চুল
স্বপ্নবাতাস লেগে একটু একটু কাঁপছিল

উনিশ বছর বয়সে তাকে দেখলাম করঞ্জ গাছের নীচে
সুষন্তি আর করঞ্জ ফুল তখন টিপটিপ করে ঝরছিল
মাঠ পার হয়ে হাওয়া এল
উড়িয়ে নিয়ে গেল করঞ্জ ফুলের সঙ্গে তাকেও

তারপর তাকে একদিন দেখলাম ভীড়ের মধ্যে
আমার দিকে তাকিয়ে হাসল
আমি তার হাসির দীর্ঘ রাস্তা ধরে
তার দিকে এগোতে লাগলাম…

সেদিন আবার তাকে দেখলাম বইমেলায়
একা একা ডুবে আছে বইয়ের মধ্যে
আমি পেছন থেকে গিয়ে তার বইটা টেনে নিলাম হাত থেকে
সে হাসল না শুধু বইটা ফেরৎ চাইল
তখন সেই বই থেকে সাদা পাতা
একটি একটি করে সাদা পাখী হয়ে উড়ে গেল দিগন্তের দিকে
আর বইয়ের পাতা থেকে অক্ষরগুলি
আগুনের টুকরোর মত খসে পড়তে থাকল আমাদের চারধারে
সেই আগুনেই আমরা ভস্ম হলাম
অথবা কে জানে…
হয়তো আমরাও আগুন হয়ে গেলাম

ফাঁকা আওয়াজ

আমরা সব ভরাট মানুষ শুকনো খটখটে
চুপ কেন? বলো চন্দনা, বলো
কি বলছো? হবে না!
হ্যাঁ, সহজে কী আর হয় বলো—
বেশ, বিষয়টা আমিই সামলাবো
দেখি কতদূর কি হয়···

কবে? না না এত দ্রুত নয়
আগামী শনিবার
যদি পেরে উঠি···

তেমন কিছু নয়, অনেক টাকা চাই
ঠিক, কবিতা লিখে হবেনা জানি
উঁহু সেসব নয়
টাকার ওপরে কদিন ঘুমোবো

কত আর বয়েস হবে বলো
চারদিকে ফাঁকা আওয়াজ
ভালো শুনতে পাচ্ছি না
চন্দনা প্লিজ, যা বলবার জোরে বলো।

অবশেষে

চাকরি বাকরি আর নেই
আমি একটা চায়ের দোকান খুলেছি।

ভেতরে বসতে দেব জায়গা কোথায়
ছোট্ট গুমটি ঘর
দিনরাত আগুন জ্বলছে

দুটো বেঞ্চি পেতে রেখেছি সামনা সামনি
আসুন ভাই, বসুন
ইঁদুরের গর্তে সারাদিন তো আর মাথা তোলার
ফুরসত পান না
খোলা আকাশের নিচে বসে এক কাপ গরম চা খান।

স্বাদে গন্ধে ভরপুর অন্য সে জীবন
মাটির ভাঁড়ে নিজের হাতে পরীক্ষা করে দেখুন
ঠাণ্ডা পৃথিবীটা উষ্ণ উষ্ণ মনে হবে।

একপাশে বে আবরু রেললাইন
অন্যদিকে চটকলে দিনরাত কাঁপে মফঃস্বল
মধ্যেখানে দুটো বেঞ্চি পেতে রেখেছি সামনা সামনি।

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চোর চোর খেলা

বেঁচে আছি, মুখে মেঘ, আছি জলাপাহাড় পেরিয়ে
বেঁচে উঠি শব্দরাগে, আর বাঁচি পাগল খেপিয়ে

পাগল স্বয়ং এই কথা জানে, কিন্তু মৃদুভাষী হ'য়ে রোজ
কুশল প্রার্থনা করে, আর বলে : তোমার বাড়িতে হ'লে ভোজ

ডেকো কিন্তু। ডাকি না কোনদিন তাকে, এই ভয়ে, যদি সে বেফাঁস
কোন কিছু ব'লে ফেলে, হায় দিন, হায় রাত্রি, হায় লিপ-ইয়ারের মাস!

রাজসাক্ষী

তুমি জ্বলেছিলে তোমার আগুনে
আমার তো হাত ছিল না
আমি বড় জোর নষ্ট হয়েছিলাম

আজ এই কথা শুনে যদি লোক
আমাকে ফাঁসিতে লটকায়
যদি তুমি কম বয়সের
ডাকে ফিরে ওঠো পোড়াকাঠ ফেলে
থামাও, আমাকে থামাও

শুধু ওই জলপানি পাওয়া পণ্ডিত
যার হাত ঘুরেছিল সব থেকে বেশি
সেই দিন, ব্যাটা এখনো আমাকে শাসায়
ফাঁস করে দেবে সব

দিতে সে পারেই, বলতেও পারে
কেন যে এমন চিত্র এঁকেছি
ভেসে গিয়ে আমি পগাড়ের পাড়ে
ভেসে ভেসে জলে, বিশবাঁও!

শিবায়ন ঘোষ

জীবিকা সমাচার

হৈ হৈ করে আমি কথা বলি?
আমার জীবিকা
গান গাই, বইপড়ি, ছবি আঁকি?
জীবিকা আমার

জীবিকা কক্ষনো নয় শুধু এই ভোর থাকতে
গাড়ি পাকড়ে এয়ারপোর্ট,
শাদা পোশাকে নজরদারি এই, এইটুক্
আর যা-ই থাকুক সুখের, এরমধ্যে
জীবিকাটুক্ নেই

এরচেয়ে ভালো হয় কয়জনে হঠাৎ উধাও
নুন কম, আদা বেশি, এই মাংস বচসা করে খাও

অথবা হোলির দিনে বড় বেশি খুনসুট্
কিশোরীর মুখ লক্ষ করে—
রঙ চিনে রঙের নির্ণয়…
এ-জীবিকা কদাচিৎ, বছরশেষে একবারই হয়॥

নাগ সেন

শান্তিনিকেতন—১৯৮৯

নীল অজগর বৃষ্টি তার অগ্নিময় থাবা তুলে
ধরলো সহসা। মনে পড়ে দীপাঞ্জনা—

তখন নৈঋত মেঘে ইউক্যালিপটাশের শোভা
কতদূর শিল্প সম্মত : এই নিয়ে তুমুল তর্কের ভেতর
আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি প্রান্তিক স্টেশন।

আরো কিছু সন্ধ্যা হলে এই কোলাহল থেমে যাবে—
আলোকিত লোকালয়ে আমাদের বাধ্যবিদায়
কিছু দীর্ঘ নীরবতা বাতাসে ছড়াবে।

সন্ধ্যা ঘনঘোর হলে কেন কোলাহল থেমে যায়—
সঙ্গম শেষের মতো অদ্ভুত-বিপ্ন-ছায়া নেমে আসে ?

সন্ধ্যার শরীরে এতো মদ দেখি এতো অগ্নিবীজ
তবু সন্ধ্যা নেমে এলে আমরা হারিয়ে যাবো।

কেন কোনো প্রতিবাদ এখনো হলোনা শেখা
বাধ্যবিদায়—তাকে ভেঙ্গে দিতে কাঁচের মতন !

পৌলমী সেনগুপ্ত

টেলিফোন

মাঝরাতের অন্ধকার ভালভাবে ফোটার আগেই—
ওরা আমায় টেলিফোন বাজিয়ে ডাকে

আমি সবে পাশ ফিরেছি
নাছোড়বান্দা বালিশ জড়িয়ে
ফ্রকটা গুটিয়ে গেছে কোমর অবধি
বেহায়া টেলিফোন ঝনঝন ক'রে
ভাঙাভাঙা নেচে যায় মেনকার মত

মশারিটা ঝুলে থাকে দুর্বল মিথ্যেকথা
কালো শামলা পরা টেলিফোন
ছিঁড়ে দিচ্ছে তার আধখাটানো শামিয়ানা
জানালা ডিঙিয়ে রাস্তার মাতাল আলো
ঢুকতে চায় ভদ্রলোকের ঘরে
আর তার পিঠে এলোপাথাড়ি চাবুক
চালাচ্ছে অন্ধকার

লাফ দিয়ে উঠলাম
দেখি
আয়নায় মুখ দেখছে টেলিফোন
আর একলা মনমরা ঘুম
বসে আছে দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে

মৌসুমী চক্রবর্তী

একবিংশ শতাব্দী

এক নৌকো থেকে
আরেকটায়
ছোট্ট লাফে···টলোমলো
মাঝে গভীর···
শতাব্দীর বদল।
হাত ঘোরালেই
নাড়ু
মুঠো খুললেই
আকাশ
চোখ বোজালেই
স্বপ্ন
চোখ খুললেই
কম্প্যুটার
আর
সবার জন্যে
ক্ষিধে ॥

মেঘ

ও মেঘ, আমি
সারা পৃথিবী তোলপাড় করে
তোমার জন্যে বৃষ্টি এনেছি
আমায় একটু ভালবাসবে তো?

শবরী ঘোষ

বাতাসের হাতে কুসুম এবং অস্ত্র

হাওয়ায় অনেক বল্লম উড়ে চলে
হাওয়ায় রঙীন মাছেরা সাঁতার কাটে
হাওয়ার নদীতে কুমারীর এলো চুল,
হাওয়ার মাঠেই বনজ্যোৎস্নাও ফোটে।

আমি তাই খুব সন্তর্পণে থাকি
ভুলেও যাইনা বাতাসের কাছাকাছি,
বাতাসের নখে আমার বুকের রক্ত—
বাতাস আমার সন্ধ্যের কানামাছি।

প্রখর হাওয়ায় অশরীরী হয়ে ঘুরি
সাতটি পাহাড় তুলে নিই বুকে পিঠে
দু'রকম ভাষা পাথর বলে না কাউকে
একরোখা নদী পাহাড়ের পাদপীঠে।

বহন, আমার বহন করার শক্তি
চুরমার করে ভাঙছে দিব্য প্রতিমা
বাতাসের হাতে কুসুম এবং অস্ত্র,
ফের গড়ে দেয় স্বপ্নের মেঘ-সীমা।

দিব্য মুখোপাধ্যায়

পুরোনো খাতা, তোমাকে

বাতিল পদ্যের খাতা, দেখো, শুকনো পাতা ওড়ে শীতার্ত বিকেলে।
ছুটতে ছুটতে কারা ঢুকে যাচ্ছে অন্ধকারে, ধোঁয়ার ভেতর—
নোংরা নালা থেকে একটা কাটামুণ্ডু, ঠোঁট নড়ছে তার—
এফোঁড়-ওফোঁড় হাওয়া, শুধু করাতের শব্দ,—কারা শান দিচ্ছে রাতে—
মেয়েটা পাগল হয়ে খোঁজে তার সেই কেটে-পড়া প্রেমিককে—
ভালবাসা, শেষ ভালবাসা
হিম ঠাণ্ডা হাওয়া, ছুঁয়ে যাচ্ছে, হায়—ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, কান্না—
বাতিল পদ্যের খাতা, টুকরো ভাঙা শব্দে তুমি এঁকে রেখো সব—
মাথার ভেতরে বৃষ্টি, ধুয়ে যাক সমস্ত অক্ষর—কালো রাস্তা, গলি
ছায়া-অন্ধকার, পাপ, বিষাক্ত পৃথিবী—ভুলে যেও ওগো,
এই নষ্ট প্রজন্মের কথা—
দেখো, প্রজাপতি, টাটকা রঙ একঝাঁক উড়ে আসবে আজ।

অমিয় চক্রবর্তীর অপ্রকাশিত পত্র

New York
March 9, 1977

শ্রীপ্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
যাদবপুর

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠিখানি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আপনি জানেন আমি আপনার কবিতার অনুরাগী। কিন্তু সাম্প্রতিক কোনো কবির বিষয়ে লিখব না এ বিষয়ে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। চিঠিতে সামান্য ব্যতিক্রম করেছিলাম মাত্র। আপনার পূর্বের কবিতার বই এবং এই নূতনটি আমার বিশেষ প্রিয়।

সাম্প্রতিক কোনো কবির বিষয়ে লেখা নিয়ে অনেক দুঃখ পেয়েছি। তা ছাড়া আমরা যারা কাছাকাছি কালের বাসিন্দা, আমাদের অনেকটা পরিপ্রেক্ষিতের অভাব পরস্পরের সম্বন্ধে। যাচাই করবার শক্তি বা অধিকার অনুভব করি না। কিন্তু এ সবই মূল ভাব। উপভোগের দিক থেকে অপ্রাসঙ্গিক—চতুর্দিকের ভালোমন্দ বিচার খানিকটা উপেক্ষা করেই আপনি লিখে যাবেন। আপনার গদ্য রচনার সংগ্রহও মধ্যে মধ্যে বার করুন।

মধ্যে কদিনের জন্য Oberlin College (Ohio-য়) গিয়েছিলাম—খুব ভালো লাগল। Cleveland-এ অনেক ভারতীয় লেখক শিল্পীর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগল। যদিও স্বীকার করব যে আধুনিক Indo-Anglian কবিতা সম্বন্ধে বা অত্যধিক অনুবাদ সম্বন্ধে আমি উৎসাহী নই। স্ব-ভাষায় লেখাটাই স্বাভাবিক—অন্য ভাষার মর্মস্থানে প্রবেশ করা প্রায় অসাধ্য বললেই চলে, হয়তো দুচারটে ব্যতিক্রম থাকতে পারে। ভারতবর্ষ জুড়ে অক্ষম ইংরেজিতে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা একটা দুঃখবহ ব্যাপার। অথচ যাঁরা ঐভাবে লেখেন তাঁরা ভালো মনে করেই লেখেন।

আশা করছি ইলেক্‌শনের পরে ভারতবর্ষ খানিকটা শান্ত এবং যথার্থ সক্রিয় হবে। যেখানে অত অভাব এবং সর্ববিধ দুরবস্থা সেখানে

প্রাথমিক দায়িত্ব লোকসমাজের উন্নয়ন করা—রাজনীতির নেশা অনেক সময়ে এই সৃষ্টি কাজ, সেবার কাজের পরিপন্থী। ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, সাহিত্যের আগুন নেভেনি। এখনো বহু প্রদীপ জ্বলছে।

আপনারা আমার প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন।

আপনাদের—
অমিয় চক্রবর্তী

পত্র : ২

শান্তিনিকেতন,
১০ই নবেম্বর ১৯৭৭

শ্রীপ্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
কলকাতা

প্রিয়বরেষু

যদিও আমার বিষয়ে লেখা তবু আপনার প্রবন্ধের শালীনতা এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির উদ্দেশে সাধুবাদ জানাতে চাই—অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে আপনার রচনাটি গ্রহণ করেছি।

কবিতার স্বভাব এবং নির্মিতির পরিচয় আপনার সুবিদিত। তা ছাড়া আপনি আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন অন্তি-অনন্তির প্রচলিত কাঠামোর বাহিরে আমাকে তৃতীয় উপলব্ধির স্থান দিয়ে। অনেক কাল পূর্বে "মেলাবেন" কবিতাটা লিখেছিলাম। কিন্তু তখনো একটুকুও ভাবিনি যে কোনো একটি বিরাট নৃ-জাতীয় পুরুষ ভাঙা দরোজা, ফাটা হৃদয়, অন্যায় অত্যাচারের দারুণাকে জোড়া দিতে সক্ষম; সমস্ত কবিতাটা সেইরকম ঐশিকতার বিরুদ্ধে ইস্তাহার। কার সাধ্য জগতের তীব্র নিরর্থক ঔদাসীন্যধারাকে "নরম মেঘের" উপর থেকে রদ করবে। অলৌকিক উপায়ে সব অসঙ্গতি নিষ্পন্ন করার চিন্তা আমার কাছে তখনো অলীক মনে হত, তাই ক্ষুব্ধ চৈতন্যের প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলাম। নিশ্চয়ই কথাটা তেমন স্পষ্ট হয়নি কেননা ঐ কবিতাটাকে অবলম্বন ক'রে বারেবারে অনেকের অতি তৃপ্ত ভাব কিম্বা রুষ্ট আক্রমণ আমার কাছে পৌঁছেছে;

অথচ যা আমার কাছে স্পষ্ট তা নিয়ে লিখতে রুচি হয়নি। আপনার আলোচনায় নানা দৃষ্টান্তসহ এবং গভীর অনুশীলিত চিন্তার যোগে আমার কাব্যধর্ম নূতন স্থান পেয়েছে।

একান্ত আত্তির পিছনে আত্মশক্তির আবাহনকেই যথার্থ মানবিক মূল্য দিতে চাই। মেনে নেওয়ার উল্টো পথে এই প্রতিবাদ। "বিশ্বাসের" একটি চেতনা-লব্ধ অনুভূতি যা কবিতায় শিল্পে প্রত্যহের ক্ষণিক অভিজ্ঞতায়।

হঠাৎ ধরা পড়ে তাকে কী নাম দেওয়া যায়? মতবাদের নিকষে তার কি যাচাই হয়—অথচ মতবাদের আবর্তে আমরা সবদেশেই বিপর্যস্ত বিদ্রূপিত হচ্ছি: আপনার নিজস্ব কবিদৃষ্টি এখানে আমাদের সহায়।

আপনারা আমার ও হৈমন্তীর প্রীতি জানবেন।

অমিয় চক্রবর্তী

প্রসঙ্গ : কবির ভাবমূর্তি

শ্রীপ্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রিয়বরেষু

অনেক হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত 'অলিন্দ' (গ্রীষ্ম-সংকলন, ১৩৯৭) আমার হাতে এসেছে। অসংখ্য ভালো কবিতার মধ্যে আমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ কবিতাটি দেখে লজ্জা পাচ্ছি, বিশেষ ক'রে, আপনার সম্পাদকীয়টির সঙ্গে যেহেতু তা একান্ত অসংগতিপূর্ণ।

সম্পাদকীয়র প্রসঙ্গ যখন উঠলোই, তখন দু-চারটে জরুরি কথা বলি :

১. 'কবিতা লেখকেরা সাধারণত কবিতার বই কেনেন না' কথাটা যথার্থ না-ও হতে পারে। 'সাধারণত' শব্দটি আমি লক্ষ্য করেছি, তবু বলি, মন্তব্যটি সাধারণীকরণের যোগ্য নয়। চর্যাপদ থেকে সাম্প্রতিকতম 'কবিতা লেখকের' কোনো-না-কোনো বই আমার সংগ্রহে আছে ; এদের পঁচাত্তর শতাংশ আমার কেনা ; আপনার যে-বই আমি আগ্রহে রেখেছি, তা আপনার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাইনি। ইদানীং অবশ্য ক্রয়-সামর্থ্য কমে যাওয়ায় লোকের কাছে আমাকে ভিখিরির মতো হাত পাততে হয়।

২. 'সব লিটল ম্যাগাজিনে…লিখে যাওয়াও…বিপজ্জনক' কথাটা অসত্য প্রমাণ করার জন্যই, বোধহয়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওই গর্তে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। আমি নিজেও এখন সেই বিপজ্জনক পথের অন্ধ পথিক। দেখা যাক, ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

৩. 'তৃণমূলের…' কথাটা রাজনীতিকের বা সমাজতাত্ত্বিকের মুখে এতোদিন শুনে এসেছি, তার অর্থটা মোটামুটি বুঝি ; কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার বিষয়, 'তৃণমূলের কবি' কথাটা আদৌ বোধগম্য হলো না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কোন দলে পড়েন?

৪. 'Poetry from Bengal'—নামক একটা সংকলনের উল্লেখ আপনি করেছেন। আপনার মতো রুচিমুগ্ধ, সর্বতোভদ্র, সংযমী ও আত্মস্থ কবি এই প্রসঙ্গটি টেনেছেন দেখে আমি নিজের কাছেই লজ্জিত, আর তাই, বহু চেষ্টা ক'রে—আপনার প্রতি অনুরাগবশত ক্ষোভ ও ক্রোধকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিদায় দিয়ে, বিনীতভাবে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলছি :

ক. বইটি, সম্ভবত, আপনি স্বচক্ষে দ্যাখেননি ; এই সংশয়ের কারণ :

অ. অনুবাদকের নাম Ron D. K. Banerjee.

আ. বইটি UNISEF থেকে বেরোয়নি, বেরিয়েছে FOREST BOOKS / UNESCO থেকে।

ই. বইটি দেখে থাকলেও ভূমিকাটি নিশ্চয়ই পড়েননি। যদি পড়তেন, তাহলে কবি-নির্বাচন ও কবিদের নামের আপাত-এলোমেলো ক্রমের কারণ বুঝতে পারতেন।

খ. এদেরও কবিতা যখন আছে, এঁদের নেই কেন—এই যথারীতি প্রশ্ন সহজভাবেই আপনি তুলেছেন। এ-ব্যাপারে আমি কোনো বিতর্কে যাবো না, শুধু আমাদের দেশেরই কয়েকটি অতি উল্লেখযোগ্য সংকলনের কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই : বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (প্রথম সংস্করণে অরুণ মিত্র নেই, তৃতীয় সংস্করণ অরবিন্দ গুহ-অলোকরঞ্জনে [১৯৩৩] থেমে গেছে) ; বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা' (গণেশ বসু আছেন, অথচ…) ; সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং 'সাহিত্য অকাদেমি' প্রকাশিত কবিতা-সংকলন (পবিত্র মুখোপাধ্যায় আছেন, অথচ…) ; শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'The Blue and the Anarchy' (বন্ধনীর মধ্যে কিছু না-বললেই ভালো, শুধু 'Anarchy' শব্দটি আরেকবার উচ্চারণ করা যায়) ; বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা' (আলাউদ্দিন আল আজাদ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, অথচ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত নেই)।

আসল কথা হচ্ছে এই, যদি নকশাল-মতবাদে বিশ্বাসী কেউ সেই মতবাদের সমর্থনে লিখিত কবিতার কোনো সংকলন করেন, তাহলে আমার আপনার কবিতা তাঁরা তাঁদের সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করবেন কেন? আমাকে আপনাকে বাদ দিয়ে তাঁরা তো ঠিক কাজই করবেন।

গ. 'অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কোনো কবিতা নেই অথচ অলোকরঞ্জন-ভক্ত সামসুল হকের কবিতা আছে'—আপনার এই মন্তব্যের প্রসঙ্গে এবার আসতে অনুমতি দিন। আপনি হয়তো এবার বিড়বিড় করছেন : ঝুলি থেকে এতক্ষণে বেড়াল বেরুলো। বিশ্বাস করুন, ঝুলির মধ্যে সত্যিই কোনো বেড়াল নেই ; তাছাড়া আপনার মতো সহৃদয় কবির সামনে এসব করতে যাবো কেন? আমাদের সম্পর্ক তো ভালোর চেয়েও ভালো।

কথাটা 'ভক্ত' শব্দটি নিয়ে। সাধারণত 'ভক্ত' কথাটা আমরা এই-রকম লৌকিক (প্রাকৃত) অর্থে ব্যবহার করি : 'প্রভুভক্ত কুকুর' বা 'ইশ্বরভক্ত সন্ন্যাসী' বা 'মাছি আম-কাঁঠালের ভক্ত'। অনুগ্রহ ক'রে বিশ্বাস করুন, আমি কুকুর কিংবা সন্ন্যাসী কিংবা মাছি নই (এখনকার কবিদের মধ্যে অবশ্য দু-একজন জবরদস্ত ডুমোমাছি আছে)। আমি অলোকরঞ্জনের কবিতার একজন চক্ষুষ্মান্ অনুরাগী মাত্র। এখনো তিনি আমার (একালের) প্রিয়তম কবি; কিন্তু আমি তাঁর অনুকারী বা অনুসারী নই। কতো অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা শুনতে পাওয়া যায় : 'দেশ' পত্রিকায় (বোধহয় ১৯৭০/৭১ সালে) প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় লিখলেন, আমার কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাপ আছে; বছর পাঁচেক আগে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার লিখলেন, আমি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী! এবারে ব্যক্তি-অলোকরঞ্জনের প্রসঙ্গে আসি। সজ্জন 'মসৃণ' ভদ্রলোক। আমার দ্বিতীয় বই 'নিজের বিপক্ষে' তাঁকে উৎসর্গ করি। বোধহয় ১৯৬৭/৬৮ সালের কথা, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একবার 'সাহিত্য অকাদেমি'-প্রকাশিত 'Indian Literature-এর একটা সংখ্যার পাতা উলটে দেখালেন —অলোকরঞ্জন-লিখিত একটি প্রবন্ধ, আর তাতে জ্বলজ্বল করছে : 'Nijer Bipokshe' by Mrinal Basu Chowdhury! কিছু কথাবার্তা বলার জন্য appointment চেয়ে গত দু-বছরে আমি তাঁকে তিনটি চিঠি দিই। প্রতিবারেই তিনি জানিয়েছেন, দেখা করবার মতো সময় তাঁর হাতে মোটেই নেই। অথচ, জানি, ঘরভাত বাচ্চা-কবিদের পরম সমাদরে তিনি মিষ্টান্ন খাওয়ান।

আপনার কাছে 'শ্রেয়তর' কবিদের তালিকায় পূর্ণেন্দু পত্রী মহাশয়ের নাম আছে। আপনিও কি তাঁকে মণীন্দ্র গুপ্ত বা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে বড়ো কবি ব'লে মনে করেন? আমার দুর্ভাগ্য, আমি তাঁকে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বা গিরীশচন্দ্র ঘোষের সমগোত্রীয় মনে করি। ধান-ভানতে-শিবের-গীতের মতো এই সুযোগে ব'লে নিই, মণীন্দ্র গুপ্ত যদি পেশাদার প্রচ্ছদ-আঁকিয়ে হতেন, তাহলে শ্রী পত্রীর স্থান হতো সগররাজার ষাট হাজার পুত্রের দেশে। আর ফিল্ম? সে তো ফিলিম। বেচারা মৃণাল বসুচৌধুরী (শ্রীপত্রীর কাছে কখনো প্রচ্ছদ আঁকাতে যাইনি, ফলে ব্যর্থ হইনি)!

ঘ. আপনি লিখেছেন, 'যাঁদের কবিতা আছে, তাঁদের হেয় করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।' প্রিয় প্রণবেন্দু, শব্দের বাচ্যার্থই কি সব? এক্ষেত্রে বাচ্যার্থ ধরলেও 'হেয়' শব্দের অর্থ অভিধানে নোতুন ক'রে লিখতে হবে। আচ্ছা, 'শ্রেয়তর' শব্দটি কি ঠিক?

ঙ. আলোচ্য সংকলনটিতে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত/আলোক সরকার/প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কবিতা থাকবে না জানলে হয়তো আমি সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করতুম না। আবার ভাবি, কেনই-বা করবো না,—যথেষ্ট ঔদ্ধত্য নিয়ে মনে মনে বলি : আমি তো অলোকরঞ্জনের চেয়ে ছোটো কবি নই।

চ. আপনি ভাবমূর্তি বা ইমেজের কথা বলেছেন; আমি 'Charisma' শব্দটি যোগ করি। আপনার কথা অবশ্যই অনেকাংশে ঠিক। কিন্তু মাঝেমাঝে সেটাও কেমন যেন গুলিয়ে যায়।

আমেরিকার কোন-এক বিশ্ববিদ্যালয়—আইওয়া না তাইওয়া—বছর-বছর কবি-সাহিত্যিকদের অন্নপ্রাশনের না বিবাহের না শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করে। বলতে পারেন, কী সুবাদে তারাপদ রায়, কবিতা সিংহ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্তরা এদেশের প্রতিনিধি হয়ে সেখানে যান—যেতে পারেন? কোন ইমেজের জোরে সজল বন্দ্যোপাধ্যায় বই প্রকাশ করতে পারেন 'আনন্দ পাবলিশার্স' থেকে, 'রূপা' থেকে শান্তিকুমার ঘোষ?

কতো শ্যামাদাস তো রবীন্দ্র-পুরস্কার, অকাদেমি-পুরস্কার পেলো, এখনো ঝি অলোকরঞ্জন এই দুই পুরস্কারের যোগ্য নন? তাঁর তো যথেষ্টরও বেশি 'ইমেজ' আছে। অঙ্কটা বড়ই জটিল, কিংবা খুবই সহজ : সমস্তটাই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার। সুতরাং, সব ধরনের বিরুদ্ধে চাই সশস্ত্র সর্বাত্মক আক্রমণ।

সানুরাগ প্রীতি-সহ—

সামসুল হক

ত্রুটি-স্বীকার : এই সংখ্যায় ৬১ পৃষ্ঠায় সুদীপ বসুর কবিতাদুটি তাঁর লেখা নয়। অন্যের লেখা তাঁর নামে ছাপা হওয়ার সম্পাদকীয় অসতর্কতার জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক।

আলোর বৃত্ত থেকে সরে, নিজস্ব ভূমিকায়

অরুণকুমার ঘোষ

আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় দশক বিভাগের যে প্রচল, তার যৌক্তিকতার ভিত যত দুর্বলই হোক, তার নিরর্থকতা, অপ্রয়োজ্যতা নিয়ে তর্কের জাল যতই বুনে চলা যাক, আলোচনা শুরু করতে গিয়ে হতাশ, বিমর্ষ চিত্তে উপলব্ধি করতেই হয় যে, ঐ বহুল-ধিক্কৃত দশক বিভাগকে পরিহার ক'রে চলার সত্যিই কোন উপায় নেই, কারণ তা আলোচনার চৌহদ্দিটাকে একরকমভাবে চিহ্নিত ক'রে তোলে; আর ঐ সীমানাচিহ্ন অনুধাবন করেই আমরা আধুনিক কবিতার বিভিন্ন ধারাকে, তাদের স্বতন্ত্র প্রবণতাগুলিকে কিছুটা সুনির্ধারিতভাবে বুঝে নিতে অগ্রসর হই।

পঞ্চাশের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল কবিকৃতির পাশে ষাটের কবিকৃতিকে প্রথম পরিচয়ে ঈষৎ কুণ্ঠিত, ম্লান, অনিশ্চয়-ভারাক্রান্ত ব'লে মনে হতেই পারে। এক নজরে ষাটের কবিতাকে মনে হয় যেন ছড়ানো-ছিটোনো, অগোছালো। কিন্তু একটু ধৈর্য, আন্তরিকতা, সংবেদনা নিয়ে বিশদ ও বিস্তৃত পরিচয়ের সন্ধানে নিয়োজিত হলে ষাটের কবিতায় যে বিচিত্র ও বিষম মানসতা, আবহ, কাব্যাদর্শ ও রূপগত নিরীক্ষার স্ফুরণ চোখে পড়ে তাতে বিস্ময় ও ঔৎসুক্য স্বাভাবিকভাবেই জেগে ওঠে। বিষাদময় স্মৃতিভারাতুর গীতলতার পাশেই এখানে দীপ্ত হয়ে ওঠে সমীপ দেশকালের আর্তি, উৎকণ্ঠা, সংগ্রামকে আত্মের উচ্চারণে আত্মস্থ করে নিয়ে লেখা দায়বদ্ধ কবিতা। এখানে পাই, দীর্ঘ কবিতা নিয়ে একাগ্র প্রয়াস আবার কবিতায় নূতন রূপের সম্ভাবনাকে অনেকদূর প্রসারিত করে নিতে কাব্য-পঙ্‌ক্তির দৃষ্টিগ্রাহ্য তথা চিত্রময় বিন্যাস যা ছুঁতে চায় কংক্রিট কবিতার বিমিশ্র রূপকল্পকে, কবিতার শব্দকে একক বিচ্ছিন্নতায় স্থাপন ক'রে তার নিজস্ব ওজন বুঝে নেওয়ার বা তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দানের প্রয়াস, আবার ক্ষুৎকাতর কবিতার চীৎকৃত উন্মাদনা জীবনের ক্লেদ ও কলুষকে এক পূত তাৎপর্যময়তায় অভিষেক, জীবনের সবকিছুকে কবিতার বিষয়ীভূত ক'রে সামগ্রিক জীবন ও কবিতার মধ্যেকার আড়ালটুকু ঘুচিয়ে দেওয়ার বা

জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে কবিতাকে একেবারে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, আর এই পথে কৃত্রিম কাব্যিয়ানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে, তাকে বাতিল ক'রে, কাব্যিক ও অকাব্যিক ভাব ও ভাষার মধ্যেকার নিরেট দেওয়াল গুঁড়িয়ে দিয়ে, বহমান জীবনের আটপৌরে ভাষা ও ভঙ্গিকে বা আঁকাড়া রুক্ষ বন্ধুর গদ্যকে কবিতায় স্বাগত জানানোর অপ্রতিরোধ্য তাগিদ যা পৌঁছে যেতে চায় অ্যান্টি-পোয়েট্রি বা বিরুদ্ধ-কবিতায়। আর এইভাবেই সাবলীল ছন্দোময়তায় বা অন্তর্লীন ছন্দোপ্রবাহে ও সচেতন ছন্দো-হীনতায়, পদ্যে-গদ্যে, ফুটে ওঠে এক বর্ণিল বুনট। শুধুই তুখড় আত্মপ্রচার, প্রদর্শনস্পৃহা, সপ্রতিভ পারিপাট্য কি নাটকীয় ভাষাভঙ্গির চমকে নয়, সহজাত সৃষ্টিসামর্থ্যের জোরেই পঞ্চাশের কবিরা লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় সামান্য কিছুকাল কাব্যচর্চা করেই অচিরে প্রতিষ্ঠানের মনোযোগ আদায় করেছেন, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয়েছেন, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। ষাটের কবিরা যে সকলেই মূলতঃ বা আন্তরিকভাবে প্রতি-ষ্ঠান-বিরোধী ছিলেন তা নয়। বাহ্য ঔজ্জ্বল্যের অনুপস্থিতি বা সহজাত শক্তির আপেক্ষিক ন্যূনতা, যে কারণেই হোক প্রতিষ্ঠানের ত্বরিত দৃষ্টি আকর্ষণে তাঁরা প্রায় বিফল হলেন; পরে প্রতিষ্ঠানিক পত্রপত্রিকার পাতায় তাঁদের কয়েকজন ঠাঁই পেলেও প্রতিষ্ঠানের পোষকতায় তাঁরা তেমন উচ্চনিনাদী প্রচারগৌরব লাভ করতে পারেন নি। তাই তাঁদের কেউ অভিমানে, কেউ ক্ষোভে, কেউ ক্রোধে, কেউ কেউ সুস্থির অণুচিন্তায় নিজের আদর্শ, লক্ষ্য ও অবস্থান নির্ধারণ ক'রে নিয়ে কখনও সমমনস্ক কবিদের নিয়ে একটি ছোট গোষ্ঠী তৈরি ক'রে, ক্ষুদ্র সাহিত্যপত্র বা লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় আত্মপ্রকাশের স্বাধীন সুযোগ খুঁজে নিতে চাইলেন।

পঞ্চাশের কবিতার রেশ ষাটের কবিতা থেকে কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যায় না। এ সূত্রে বিশেষভাবে মনে পড়ে যায় অকালপ্রয়াত তুষার রায়ের কবিতার কথা। পঞ্চাশের কবিতায় 'কৃত্তিবাস'-কবিগোষ্ঠীর কারও কারও লেখায় সপ্রতিভ চতুর কথা বলার কৌশলে যে বাহ্য চটক আসে, নিজের জীবনকে কবিতার মুখ্য উপজীব্য ক'রে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা লেখার ধরনে আসে যে নাটকীয় চমক, তুষার রায়ের কবিতায় তাই এক অব্যবহিত ত্বরিত আবেদন সঞ্চার ক'রে দেয়। কবিতায় একেবারে কথা আলাপের

ধরন তুলে আনতে চেষ্টা করেন তুষার। আকাঁড়া আটপৌরে গদ্য, চলিত-অর্ধচলিত ইংরেজি শব্দ, স্ল্যাং বুলি, অবিরত ব্যবহার ক'রে, হাল্কা চালে নিজেকে নিয়ে মজা করেন তিনি, ঠাট্টা করেন, তুলে ধরতে চান বেঁচে থাকার রগড়। কিন্তু বুকের ভেতরকার চাপা যন্ত্রণা একেবারেই প্রচ্ছন্ন থাকে না। আত্মগ্লানিতে পীড়িত হন, অকপট স্বীকারোক্তিতে তাড়িত হন তিনি, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভাবনা অবিরত হানা দেয় তাঁর চেতনায়, আত্মহননের তীব্র বাসনায় তিনি উদ্বেল হয়ে ওঠেন। 'ব্যান্ডমাস্টার' কাব্যগ্রন্থের 'দেখে নেবেন' কবিতায় কবির যে নিজেকে ছিঁড়েখুঁড়ে দেখানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা, আত্মগ্লানি, মৃত্যুভাবনা প্রকাশ পায় তা মর্ম স্পর্শ করে :

'বার বার বুক চিরে দেখিয়েছি প্রেম, বার বার
পেশী এ্যানাটমী শিরাতন্তু দেখাতে মশায়
আমি গেঞ্জি খোলার মতো খুলেছি চামড়া
নিজেই শরীর থেকে টেনে,
তারপর হার মেনে বিদায় বন্ধুগণ,
গনগনে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখার
রুমাল নাড়ছি
নিভে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখে দেবেন
পাপ ছিল কিনা।

সাব্লাইম আর রিডিকুলাস, অভিজাত আর ব্রাত্য, গভীর আর লঘু, শিষ্ট আর অশিষ্টকে একসঙ্গে রেখে মাঝেমাঝে চমক দিতে চান তুষার। 'পাঁচ তারিখে' কবিতায় 'ব্রিজ নদী খুব চাপা ঘুঘু ডাকলে খোলা আকাশ,/মোষের রং মেঘ, কবিতা ও আমার মায়ের কথা/ভাবতে ভাবতে' যখন কবির মৃত্যুভাবনা জাগে তখনই তাঁর স্বর যেন গাঢ় হয়ে আসে এক নষ্টালজিক বিষাদে। 'সেইখানেই তো' কবিতায়—'সন্ত্রাস লুকিয়ে আছে সোফার ছারপোকার মতো/ তাকিয়ায় লুকানো আছে বিপ্লব বারুদ ও বোম,/দুদিন পরে মাড়োয়াড়ীতে ভাও বলবে জিনিসগুলোর।' এবং 'ডিটেলে যাবনা' কবিতায়—'খুব ক্রোধে আমি ঠিক তিনবার জবলেছি/ ক্ষোভে ফেটে দেখেছি সে বিস্ফোরণে এমনকি/ঠোঙা ফাটারও আওয়াজ নেই,...' ও 'কেবল শ্লোগান তুলি কোরাসে, সরকার/ লক্ষ যুবকের আজ চাকরী দরকার'—এই ধরনের উচ্চারণে তুষার যখন মধ্যবিত্তের ভণ্ডামীকে

উদোম ক'রে দিতে চান, তার সস্তা আত্মতৃপ্তির ফোলানো বেলুন চুপসিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান তার ক্রোধ কত নিষ্ফল, বিস্ফোরণ কত ঠুনকো, বিপ্লবের আস্ফালন কত শূন্যগর্ভ, তখন তার মধ্যে পারিপার্শ্বিকের বিকার ও ক্ষয় নিয়ে যেমন গ্লানিবোধ থাকে, তেমনি থেকে যায় আত্মবিদ্রূপের সততা, স্বীকারোক্তির অকপটতা। চটুল মিলের প্রলোভনে শব্দ সাজানোর খেলায় তুষার মাঝে মাঝে গিমিকে নেমে যান, তাই লেখেন : 'আমার বাঁশীর সুরের সুতোয়/দেহের ফুলে মালা/ট্রা রালা লি রালা লা/ঠিক চাবি হাতে দেখি খুলে যায় তালা।' (ব্যান্ডমাস্টার) বা 'হিসেব কষার মেসিনও আছে, প্রস্রাবেরও বেসিন' (করণিক)। 'মরুভূমির আকাশে তারা' কাব্যগ্রন্থে 'ব্যান্ডমাস্টার'-এর মুখ্য ভাববস্তু, মৌল মেজাজ উপস্থিত থাকলেও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিসর্গমাধুরীর শান্ত আস্বাদন, আশাবাদী প্রত্যয়, শুভবোধসঞ্জাত অস্ত্যর্থক বক্তব্যের সরাসরি উপস্থাপন, আর বাঁক ঘুরে চকিত দেখা মেলে আবহমান কবিতার মায়ার। 'আত্মায় পৌঁছও' কবিতায় পূর্বতন ঠাট্টাতামাশার মেজাজেই যখন তুষার লেখেন : 'শালা, অথবা আপন মাংসয় দাঁত দিয়ে তুমি আত্মায় পৌঁছও।', তখন কেন জানি না তার মধ্যে কিছুটা বেজে ওঠে আত্ম-উন্মোচনের গভীরতর সুর। 'ব্যান্ড-মাস্টার' কাব্যগ্রন্থের 'কম্পোজিশন' কবিতার 'কোথায় গভীর পাখী ডেকে ওঠে, বুকের কোটরে খুঁজি,/খুঁজেও পাইনা/কোনো গান উঠে এসে গলে যায় গলার ভেতরে/যেমন কবিতা রঙ অদ্ভুত ভাবে মেশে ছবিতে অক্ষরে,'—এমত বিস্ময়মুগ্ধতা ব্যতিক্রমীই লাগে, কিন্তু 'মরুভূমির আকাশে তারা'-র 'কানায় কানায়' কবিতায়—'কোন কথা ? অনশ্বর অভঙ্গুর কথা বা কবিতা/যা শুনে ঝর্ণা তার বিষণ্ণ এলোচুল খুলে দ্যায়/যা শুনলে ডানায় ভাসে দীঘির মরাল, কিংবা/হাওয়ার কাঁপনে মৃদু দোল খায় পদ্মের নাল', 'মনোক্রোম' কবিতায়—'জ্যোৎস্নার বালিয়াড়ি ছুঁয়ে এক দীর্ঘ ব্রিজ/ছায়ার রঙেতে আঁকা বন টিলা ফ্রীজ হয়ে আছে।', 'এখানে সময় এসে থমকে দাঁড়ালো' কবিতায়—'ক্রমশঃ অনেক দিন অনেক গভীর বেলা/ পার হয়ে এখানে সময়/এখানে সময় এসে থমকে দাঁড়ালো/নিসর্গ নীলিম এক আলো শুধু এসে/গভীর গভীরতম সময়ের কথা গেল বলে'—নিসর্গ সৌন্দর্যের এমন চিত্রময় বর্ণিল উপস্থাপন ও বিস্ময়-মগ্ন অনুধাবন কাব্যগ্রন্থটির সামগ্রিক অভিঘাতকে ক্ষুণ্ণ করে না। 'কবি ও তাঁর সমাধি'

কবিতায় কবির স্বর শ্রদ্ধাবিনম্রতায়, আন্তরিক বিষাদে পূত গম্ভীর হয়ে ওঠে : 'সেখানে নিঃসঙ্গ তিনি শুয়ে থাকবেন/জ্যোৎস্নার সুরভিত হাওয়া বহে গেলে পর/শবাধারে লম্ব হবে ফার্ণের ছায়া'। 'একমাত্র কবিই' কবিতায় তুষার সরাসরি নিজের বক্তব্যকে বড়ো বেশি প্রকটভাবে উপস্থিত করেন : 'একমাত্র কবিই তো করতে পারেন প্রতিবাদ/ঠ্যাঙাড়ে ও প্রতিক্রিয়াময় রাজনীতির সামনে'।

'কৃত্তিবাস'—কবিগোষ্ঠীর কোনও কোনও কবির উপস্থাপনকৌশল, উচ্চারণভঙ্গি ছায়া ফেলে শামশের আনোয়ারের 'মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে' কাব্যগ্রন্থের কবিতায়ও। এখানে শামশেরের কবিতার প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে তাঁর নিজের জীবন। নিজের বেদনা, বাসনা, গ্লানি, সন্তাপ, শোচনা, ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, আক্রোশ, জিঘাংসা, দেহকামনা-প্রতপ্ত প্রেম, ভয়ংকর প্রেম-হীনতা, তীব্র আত্মকাম—সব কিছুকে কবি তীব্র আবেগে, কিছুটা চড়া গলায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতার একটি অপরিহার্য উপাদান মনে হয় যৌনতা, অন্তহীন অবিশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষায় তিনি নারীর শরীরকে গ্রহণ করতে চান। কখনও কখনও রিরংসা দৈনন্দিনতা তাঁর ভাষাকে ছোঁয়, দেখা দেয় ফিটফাট সপ্রতিভ চতুর বাচনভঙ্গি, কিন্তু তারই মধ্যে কবির স্বর একটা ছন্দিত অন্তঃস্রোতে আন্তরিক হয়ে উঠতে চায়। নিজের রেন্দময়, তিমির-আলিপ্ত, একাকীত্ব-দুঃসহ অস্তিত্বকে 'ঘর' কবিতায় ভাষা দেন শামশের : 'অন্ধকারের নর্দমায় আমি কীট হয়ে অন্ধকার খুঁড়ে খাই/ অন্ধকারের সমুদ্রে অন্ধকার পান ক'রে বেঁচে থাকি/মৎস্য-নারীদের মতো আমি আলো দেখি না, তীর/দেখি না।' নারীর প্রতি সম্ভাষণে, তার বর্ণনায় শামশের স্নিগ্ধতা, কোমলতা, মাধুর্যকে একেবারেই প্রশ্রয় দেন না। তাই তাঁর কবিতায় পড়ি : 'শ্যাম্পেনের মতো তোমার উগ্র হাসির হাত-ছানি/ পিয়ানোর সামনে ব'সে থাকা বাঘিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়' (তোমার গলার স্বর টেলিফোনের ওপাশে) ; 'তোমার শরীরের পাতায় পাতায় আমি খুঁজেছি তারই রক্তের দাগ/বুকের মধ্যাহ্ন আকাশে যৌবনের দীপ্ত জ্বালা/আমি তোমার সবুজ তলপেট জরায়ু আর হৃদয় খুঁড়ে-খুঁড়ে/ ফিরে পেতে চেয়েছিলাম স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ'। (মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে) ; তোমার সমস্ত শরীর বেজে ওঠে ভীষণ শব্দহীন, তুমি নারী/মাতা কিংবা প্রেয়সী, তুমি সম্রাজ্ঞী হতে চাও/সম্রাটের মাতা হ'তে চাও, রজনীগন্ধা ও

শব্দের ওপর/তুমি প্রস্রাব করো এবং হেসে বলো 'এ তোমারই স্বার্থে' (তুমি নারী, মা কিংবা প্রেয়সী)। এইভাবেই শামশের তাঁর নারীত্বের ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেন, উগ্রতা, লোলুপতা, হিংস্রতা, যৌবনজ্বালা, প্রভুত্বস্পৃহা, ঔদ্ধত্য, তাচ্ছিল্যকে। 'ভালোবাসাহীনতার কষ্ট, কবিতায় ভয়ংকর অপ্রেমের রক্তাক্ত আঘাত-প্রবণতা, আসক্তিহীন দেহমিলনের বিভী-ষিকাকে ফুটিয়ে তুলতে চান কবি। 'এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা'-য় কবি ইতিহাসকে সীমায়িত দেখেন আত্মজীবনের ব্যর্থ প্রেমের অভিজ্ঞতায়, প্রেমিকার ক্রূর বঞ্চনায়, নিজের ভীষণ নিঃসঙ্গতায়, আশঙ্কা ও বেদনায়, লেখেন, 'যে নারী আমাকে পথে বসালো তার ক্রূর হাসির ছাপ/ লেগে আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়' আর 'যে সৃষ্টি আর সভ্যতা আমার বুকের বাইরে গ'ড়ে উঠেছে/তার প্রতি আমার বুকের কোনো মায়া নেই/ কলকাতা আর আমার এই নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সতোর/অপেক্ষা আমি রাখি না।' শামশের অকারণে দন্ডিত মনে করেন নিজেকে, জানান : 'বিনা অপরাধেই যাবজ্জীবন সাজা হয়ে গেছে আমার :' (একজন ব্যর্থ লোক)। আর 'কবি' কবিতায় তিনি নিজের অভীষ্ট আত্মপ্রতিকৃতিই এঁকে তোলেন : 'সে একজন প্রতিভাবান যুবক/সে একজন অসুস্থ, মিথ্যুক, নেশাগ্রস্ত মানুষ/আসলে, সে আগুনের বন্ধু এবং কবি।' 'মূর্খ স্বপ্নের গান' কাব্যগ্রন্থে শামশের অনেকটাই স্বভূমিতে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর ক্রোধ, আক্রোশ, জিঘাংসা, যৌনকামনা, প্রেমহীনতা, শোচনা, নিষ্ফলতার গ্লানি ক্ষীণ হয়ে আসে। 'বেহাল'-কবিতায় যদিচ তিনি জানান যে, তিনি বাজিয়ে চলেন 'সংঘর্ষের কথা, যক্ষ্মার কথা, ভবিষ্যতের/ছেলেমেয়েদের অন্ধত্বের কথা', 'মূঢ়, ভুল প্রার্থনা' কবিতায় অনুভব করেন : 'হাজার হাজার বন্দী সাপ ও গরিলার সঙ্গে আমরা বেঁচে/রয়েছি বন্দী হয়ে/হাজার হাজার বন্দী মানুষের সঙ্গে আমরা বেঁচে রয়েছি বন্দী হয়ে/ বুকের ওপর কবর এবং পিঠের নিচে মাটি অথবা বুকের ওপর/মাটি এবং পিঠের নিচে কবর মধ্যখানে ছড়িয়ে আছে জীবন ভক্ষ্যবস্তু', 'আর কেউ' কবিতায় কবুল করেন : 'আমার হাড়ের ভিতর ঢুকে পড়েছে শীত, নিষ্ফলা শীত' 'দিনগুলি' কবিতায় তীব্র সংরক্ত আবেগে উচ্চারণ করেন : তোমার খোঁপা থেকে, জিভ ও জিভের রক্ত থেকে/ফেটে পড়ছে কালো, বিচূর্ণ, অন্ধকার ও লাল সমুদ্র।', তবু 'বৃষ্টি' কবিতায় ক্লান্ত বৃষ্টি, ক্লান্ত কবিকে কেবলই নিয়ে

চলে 'গহন, আরো গহন বৃষ্টির ভিতর।' 'জন্ম এবং মৃত্যু' কবিতায় হিম প্রস্তর-কাঠিন্য দীর্ণ করে জেগে ওঠে নবীন প্রাণের জয়োল্লাস : 'সবকিছু নিথর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো জন্মের জন্য/আর একটি পতাকা—তার গানের উল্লাস···ছোট্ট/কিন্তু তীব্র অঙ্কুর হয়ে পাথর ফাটিয়ে দিল।' আর 'পাখি' কবিতায় পাখি যেন হয়ে ওঠে আশা-প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক : 'অন্ধ আজ জ্যোতিষ্মান হবে, বধিরে শুনবে গান/তোমরা চুপ থাকো/ পাখি আজ ফুঁ দিয়েছে বাঁশিতে'। 'সেই লাল নদী' এবং 'দুটি কালো হাঁস'-এর মতো কবিতায় পাই ফ্যান্টাসির আভাস। 'ঘুম' কবিতায় প্রাত্যহিক খাদ্যবস্তু যে মানবিক প্রত্যঙ্গের মাত্রা পায় এবং 'ঘুম-২'-এ নিসর্গের নানা উপাদানে যে সঞ্চারিত হয় মানবিক আচরণের সজীবতা তাতেও কি একেবারে অনুপস্থিত থাকে এই ফ্যান্টাসির আদল? ফলতঃ 'মূর্খ স্বপ্নের গান' কাব্যগ্রন্থে শামশেরের উপস্থাপন ঋজু প্রত্যক্ষতা থেকে যেন বাঁক নিতে চায় কল্পনারঙীন অপ্রত্যক্ষতার দিকে। 'যেভাবে বাঁচি' কবিতায় গান এবং 'নিলাম' কবিতায় কলম যেন কবির সৃষ্টিশীল দ্বিতীয় সত্তা হয়ে ওঠে। 'শিকল আমার গায়ের গন্ধে' কাব্যগ্রন্থে শামশেরের কবিতার গঠন অনেক আঁটো হয়ে আসে, উপস্থাপন হয় স্বল্পরেখ, মিতবাক্, সংহত। 'ছবি' কবিতায় কত অল্প বর্ণনায় তিনি ভেতরের ক্ষত আর ঊর্ধ্বগ আকাঙ্ক্ষাকে তাদের সংস্রক্ত রূপায়ণকে, ফুটিয়ে তোলেন : নাভির ভিতর যে ঘা আছে/নক্ষত্র আছে 'জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে সেই ঘা আর/সেই নক্ষত্র আঁকি'। 'নাম' কবিতায় প্রাত্যহিক অস্তিত্বের পীড়ন ও যন্ত্রণা স্বল্প কয়েকটি অব্যস্তিকর বা ভয়াল চিত্রকল্পে মূর্ত হয়। 'এলিজি' কবিতায় চারপাশের উপদ্রুত শঙ্কিল পরিবেশে স্বপ্নের ক্ষয়, স্পর্ধা, সাহসের অবসান কল্পনা-বর্ণিল বর্ণনায়, পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈচিত্র্যে, পুনরাবৃত্তির ধ্বনিময় অণুরণনে উপস্থাপিত হয়। 'দুজন' কবিতায় খুব সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে কবি এ সময়ের বিচ্ছিন্নতার আতি, সংযোগহীনতার সংকটকে তীব্র অভিব্যক্তি দান করেছেন। 'অনর্গল' কবিতায় কবি আমাদের বিপন্ন, ভাঙাচোরা রক্তাক্ত অস্তিত্বকেই তাৎমর্যময় বর্ণনায় ফুটিয়ে তোলেন। 'শিকল আমার গায়ের গন্ধে' কাব্যগ্রন্থে শামশেরের গলা যেমন বেশ নিচুতে নেমে আসে, তেমনি তাঁর উচ্চারণ সময়, সমাজ ও আত্মস্বরূপের আরও গহনে প্রবেশ করতে চায়।

ক্ষুৎকাতর কবিদের মধ্যে সবচেয়ে ভাস্বর দুজন—শৈলেশ্বর ঘোষ ও অরুণেশ ঘোষ। শৈলেশ্বরের কবিতায় অবচেতন থেকে অনর্গল উঠে আসে ক্রুদ্ধ ক্ষুধার্ত ভূতগ্রস্ত স্বীকারোক্তি। বাস্তব পারিপার্শ্বিকই অবচেতনের অন্ধকার মেখে কেমন পরাবাস্তব হয়ে যায়। চড়াগলার আবেগ-তীব্র উচ্চারণে কবির ক্রোধ, অভিমান, প্রতিবাদ, আক্রোশ, ভালোবাসা, যৌনক্ষুধা সব একসঙ্গে গলে মিশে ধাতুস্রাবের মতো বেরিয়ে আসে। প্রায় ছেদহীন অনর্গল বাক্যস্রোতে একটা ভাব-ভাবনা-অনুভূতির ঢেউ সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠতে-না-উঠতেই তার ওপরে চলে আসে আর একটা। যৌন-ক্ষুৎকাতরতা, যৌনশরীর, যৌনক্রিয়া, জন্ম, জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুষঙ্গ-উপকরণ, ধেনো মদ—এসব বারবার ফিরে আসে ক্ষুৎকাতর প্রজন্মের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি শৈলেশ্বরের রচনায়। কুমারী মাতা ও বেশ্যা শৈলেশ্বরের কবিতায় প্রধান দুটি মোটিফ হয়ে দেখা দেয়। কবি তাঁর জীবনের সব অপরাধ ক্লেদ, কামনাকে নগ্ন করতে চেয়েছেন। মানুষ-মাত্রেই যেন জন্ম-অপরাধী, কবি তাদেরই তো প্রতিভূ। দেহসংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ অনুচ্চার্য শব্দাবলীর অনর্গল ব্যবহারেও কবি আত্মপ্রকাশে অকপটতা আনতে চান। 'অপরাধীদের প্রতি' ও 'পূর্ণগ্রাস'—এই দুটি কাব্যগ্রন্থে চৈতন্যের নিষিদ্ধ গহ্বর থেকে যে অনর্গল আবেগতাড়িত বাক্য-স্রোত উঠে আসে, তাতে আপাতবিচ্ছিন্ন ভাবনা ও অনুভূতিপুঞ্জ প্রত্যক্ষ বিবৃতির আদলেই কবির ভেতরকার দাহ্যমান চুল্লী ও অবিরত রক্তক্ষরণকে উন্মোচন করে। 'নষ্টকীট'-এ কবি এই স্বীকারোক্তি উপস্থিত করেন : 'মা আমি তোমার কুমারী গর্ভের উপজাত ফল, তোমার গোপন/ভালবাসা নষ্ট হৃদয়-আবহ যোনি থেকে আমি এক নষ্ট সন্তান/আমি নষ্ট করে দেব তোমার সম্ভ্রম সমাজ, আমি তোমার জীবনের/নিষিদ্ধ দরজা আমি তোমার আত্মগোপনের পথ—আমার/প্রতি তোমার অসহ্য ভালবাসা, তোমার লালসা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—···' (অপরাধীদের প্রতি)। 'পূর্ণগ্রাস' কাব্য-গ্রন্থে শৈলেশ্বর যদিচ 'অভিজ্ঞতা'-র মতো সহজ বিস্ময়ে-আবেগে স্পন্দিত কবিতা লেখেন, কিন্তু তার মৌল সুর ধরা থাকে, 'মৃত্যুর পথ ঠিক করে নিতে হয় আমাদের জীবনের পথ নয়/লুকান কীট ধীরে ধীরে নষ্ট করে ডালপালা সব—(অস্বীকার) বা 'আমাদেরই আগুনে পোড়ে অরণ্য বনানী —পাহাড়ে প্রতিহত বায়ু/বুকে এসে আশ্রয় নেয়, মানুষের ক্ষুধার খাদ্য

মানুষেরই হৃদয়,/উলংগ অবস্থায় ছিটকে পড়েছি আমরা, স্থবির ইতিহাস মেনে নেয় লাথি/নির্মমতায় জেগে ওঠে শরীর, প্রাণ,—তখনই প্রকৃত ভালবাসা শুরু হয়।' (ইতিহাস ও আমাদের ভালবাসা)—এমন অনুভবে, উচ্চারণে। 'দরজাখোলা নদী' ও 'উৎসব'—শৈলেশ্বরের এই দুটি কাব্যগ্রন্থে আবহমান কবিতার স্বর অনস্বীকার্য স্পষ্টতায় বেজে ওঠে। 'আমরা পতঙ্গের ফুলের স্বপ্ন হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করি।' ('প্রপাতের দেবতা ও কুকুরগুলি,' দরজাখোলা নদী)—এমন সহজরূপকাশ্রয়ী সরল বিবৃতিই যেমন কবিতার স্পন্দনকে ধরে দেয়, তেমনই 'মৃত্যুকে দেখেছিলাম একদিন ফুলের মত—স্বপ্নের বিবরে,' (সন্ত্রাসবাদী দেবতা-ঐ) ও 'আকাশের ভালবাসা এক ফোঁটা শিশির হয়ে নেমে এল/এই রাত্রির বুকে…' (বিশ্বাসঘাতকের জুতা—ঐ) এমন ছন্দিত উচ্চারণ পাঠকের স্বপ্নকল্পনাকে প্রবলভাবে সক্রিয় করে। 'উৎসব' কাব্যগ্রন্থের, 'নির্জনতার শব্দপ্রবাহ আমাকে আবারও বধির কর, অন্ধকে আচ্ছন্ন কর/গন্ধ আর গানে, ইন্দ্রিয়গুলি সোচ্চার কর —ঘন্টাধ্বনি মন্দিরে মন্দিরে—' (উৎসব), '…সৌন্দর্য এই রাত্রির বুকে/ জাগিয়ে তুলেছে রক্তের পিপাসা—জীবন ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে ভয় আর/ ভালবাসায়' (আমার আনন্দ),—এমন উচ্চারণ কবির গহন অনুভব ও ব্যাপ্ত সৌন্দর্য-উপলব্ধিকে আমাদের গূঢ় সংবেদনায় মুদ্রিত ক'রে দেয়। অবশ্য '…আমরা বাতিল করে দিয়েছি সেই ন্যাবা-ধরা ভাষা যা আজকের ভয়ার্ত আত্মাকে আমূল ঝাঁকায় না আমরা বাতিল করে দিয়েছি সেই কবিতা যা মানুষকে শব্দের খোঁয়াড়ে বন্দী করে রাখে অভিজ্ঞতাকে মুক্তি দিতে জানে না' এবং 'কবিতা আমাদের কাছে শব্দশিল্প নয় জীবন বাজি রেখে অনুসন্ধানমূলক এক যাত্রা কবিতা আমাদের কাছে সক্রিয় শক্তি জীবনের অনুঘোষিত মাত্রা'—'উৎসব' কাব্যগ্রন্থের পিছন-মলাটে ক্ষুৎকাতর প্রজন্মের এই আত্ম-ঘোষণা, কবির বিচ্ছিন্ন কাব্য-পঙ্‌ক্তি থেকে আমাদের চোখ ফিরিয়ে তাঁর চারিত্র এবং তাঁর কবিতার সামগ্রিক অভিঘাতের দিকে চালিত করে।

শৈলেশ্বরের তুলনায় অরুণেশের স্বর সাধারণভাবে কিছুটা মৃদু, অনুচ্চ, চাপা কিন্তু তাঁর কবিতার আবেদন একই সঙ্গে অধিকতর অব্যবহিত, তীব্র ও গূঢ়। 'শব ও সন্ন্যাসী' কাব্যগ্রন্থে খুব সাধারণ প্রাত্যহিক আলাপের ভঙ্গিতে, পরিচিত অভিজ্ঞতার ছিন্ন সূত্র ধরে উঠে আসে কবিতা;

কিন্তু তার ভেতরের প্রবল চাপ, তীব্র তাপ আর গাঢ় বিষাদ আমাদের নিহিত চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দেয়। যৌনক্রিয়া, যৌনপ্রত্যঙ্গ, যৌন-রোগ, বেশ্যা, ভিখারী অরুণেশের কবিতায় ক্ষুৎকাতর প্রজন্মের জীবন দর্শনের একটা বাহ্য প্রদর্শনীমাত্র হয়ে আসে না, তা কবির গহন সত্তার আভ্যন্তর রক্তক্ষরণে অনিবার্যভাবে সিঞ্চিত হয়। যৌনতা তাঁর কবিতায় এক আশ্চর্য সান্দ্র গভীর বিষাদের নিষেকে ঊর্ধায়িত হয়ে যায়। বেশ্যা তার যৌন অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে উঠে এক নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাবিধুর মাতৃসত্তার আদিরূপে প্রসারিত হয়। নিঃস্ব, আতুর, নগ্ন মানুষ নির্বিকার খোলা আকাশের তলায় এক ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন অস্তিত্ব যাপন করছে, এই বিশ্বজনীন ছবি অরুণেশের প্রত্যক্ষ বাস্তব বীক্ষণ সঞ্জাত বর্ণনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। 'মাকে' কবিতায় পরিব্যাপ্ত গাঢ় বিষাদ আমাদের গূঢ় অভ্যন্তরে সেঁধিয়ে গিয়ে গহন সত্তাকে যেন ছিঁড়েখুঁড়ে দিতে থাকে। 'আমি দেখতে পাই, লাইট পোষ্টের তলায় তুমি বসে আছো/ ভিখিরির মত তোমার পোশাক ভিখিরির মত তোমার চুল/আধা-অন্ধ দুচোখ তুলে তুমি তাকাও', 'মা আমার, তুমি চিঠি শুঁকে দ্যাখো—সেই গন্ধ/সেই পুরোনো গন্ধ ছেলেবেলাকার', 'মা/আমাদের কোন দুঃখ নেই আর, কোন শোক/দুজনেই ঘরে পড়ে থাকবো, দুজনেই/দুই দেশের দু-রকম রাস্তার পাশে/একইরকম ভাবে'—এমন দীনতার শূন্যতাভারাক্রান্ত বর্ণনা তীব্র স্মৃতিভারাতুরতা যা উৎসমূলে নিয়ে যেতে যেতে পৌঁছে দেয় জরায়ুর গোপন অন্ধকারে আর প্রাণের সেই গূঢ় উৎস থেকে চিরতরে বিচ্ছেদের বেদনা এক অনতিক্রম্য ব্যবধানের অখণ্ডনীয় ভবিতব্যতাকে আমাদের অনুভবে সঞ্চার করে দেয়। 'লাল অন্তর্বাস' কবিতায় শান্ত, মৃদু অনুচ্চকণ্ঠে কবি জানান : 'হাঁটি বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, হাঁটি দোকানের আলো ও সার্কিট হাউসের মধ্যে দিয়ে…হেঁটে যাই। মেয়েরা এই শহরের মেয়েরা ফিরে আসছে নাচ সেরে প্রত্যেকের হাতে খোলা নুপুর প্রত্যেকেই কলহাস্যময় ও বিষণ্ণ…আমি হাঁটি খুব জ্যোৎস্না ও গাঢ়নীল মিলিটারী ব্যারাকের মধ্য দিয়ে…আমি ভেঙ্গে ফেলি রমণীর নগ্ন ঘুম ভোররাতে…'—এর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা, বিষাদ যা আমাদের গূঢ় সংবেদে অনিঃশেষ অনুরণন তুলতে থাকে। এক মর্মস্পর্শী অন্তরঙ্গতা প্রায়শই সঞ্চারিত হয় অরুণেশের

কথনভঙ্গিতে। এই অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতেই 'তোমাকে' কবিতায় ফুটে ওঠে এক সহজ শরীরী সংবেদনার প্রত্যক্ষতা। 'নারীকে—ক্রুশকাঠের দিকে' কবিতায় যেন চিনে নিতে পারি কোন আদিম কৌমসমাজের লোকপুরাণ কাহিনীর আদল। 'অতিথি' কবিতায় একটা চাপা টেন্‌শন্‌ তৈরি করে দ্বৈত সত্তার অন্তর্বিরোধ/পিতৃসত্য' [এক] শুরু হয় বেশ নীচু গলায়, অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ভঙ্গিতে : 'আমরা আমাদের ছেলেদের কথা গল্প করি'। কিন্তু শেষে কবির স্বর দুলে ওঠে গভীর আবেগে : 'ভয়ে আতঙ্কে ছুটে এসে এসে দাঁড়াই ঘুমন্ত ছেলের পাশে/আমিই বা তোকে কি দিতে পারি—কোন জীবন…?'/মেঘ ও বিদ্যুতের রাত্রিতে হাটু গেড়ে বসি আমি আমার ছেলের শিয়রে/'আমি শুধু দিতে পারি আমার অ-সুখ যা/নদীর স্রোতের মত ঘুরে ঘুরে আমাকে ছাড়িয়ে/তোর মধ্য দিয়ে—তোকেও ছাড়িয়ে ঘুরে ঘুরে/ছড়িয়ে আরও দূরে—আরও অনেক দূরে…'—এই 'অ-সুখ'-এর উত্তরাধিকার সমীপ সময় বা অব্যবহিত প্রতিবেশ ছাড়িয়ে নদীর স্রোতের উপমানে বহমান সজীবতাকে আত্মস্থ করে এক সুদূর অনির্দেশ্যতায় যেন ব্যাপ্ত হয়ে যায়। 'শব ও সন্ন্যাসীর অনেকটা খোলামেলা, স্বচ্ছন্দ, অন্তরঙ্গ গদ্য 'গুহা মানুষের গান'-এ বিদ্রূপ, ক্রোধে, টানটান এক ছন্দিত অভিব্যক্তি খুঁজে নেয়। এখানে অরুণেশ ক্ষুৎকাতর কবিদের তীব্র আর্তি, ক্রোধ, জুগুপ্সা ও বিকারকে আরো প্রত্যক্ষ ও প্রকটভাবে প্রকাশ করেন। 'মৃগীর মুহূর্তে' কবিতায় পাই : 'এরকমই হয়, ভালবাসার মুহূর্তে মৃগীর বিকার/এরকমই হয়, চুম্বনের মুহূর্তে চাপা চিৎকার' ; 'হতভাগ্যের তীর্থ' কবিতায় কবি জানান : 'মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি মিশে আছে বিকারের সাথে' ; 'গ্রহণ করো' কবিতায় কবি নির্মাণ করেন এমন জুগুপ্সা-ব্যঞ্জক চিত্ররূপ : 'ক্যান্সারে ভরা জরায়ুর মুখে থমকে আছে উল্লসিত বীভৎস চাঁদ' ; 'সংলাপ' কবিতায় কবি উপলব্ধি করেন ; '…আজ মনে হয় এত ঘৃণা/এত বিষ ছিল বলেই জেগে উঠেছে ভয়ংকর ভালবাসা'। ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে বিকারের মিশ্রণ অবশ্যই এক তীব্র অ্যাম্‌-বিভ্যালেন্স বা উভবলতাকে নির্দেশ করে। এই উভবলতা 'গুহা মানুষের গান' -এর একাধিক কবিতাতেই অনুস্যূত। 'খুলে ধরেছে শান্ত বিভীষিকা' —'গুহা মানুষের গান'-এর এই প্রথম কবিতার শিরোনামে 'বিভীষিকা'-র বিশেষণ হয়ে আসে 'শান্ত', আর এই কবিতায় কবি অত্যাচার, লাঞ্ছনা, নির্যাতন, নিপীড়নের মত্ততা ও উন্মাদনার ঘোরকে প্রকাশ করেন :

'নির্যাতন, তোর বিষ এখনও বিস্বাদ হয়ে যায়নি জীবনে/নির্যাতন, তোর নেশা কোন রক্ত গোলাপের কাছে নিয়ে আসে।' 'প্রতারিতের ভোর'-এর শেষাংশের যদিচ স্বপ্নময় প্রত্যাশার স্বর্ণাভ আলোক বিকিরিত হয়, তবু ঐ কবিতারই প্রথমে কবি জানিয়ে দেন : 'প্রতারক যে, সেও তো নিজেকে ভাবে প্রতারিত।' 'গ্রাস করে নিতে চায় ঘাস' কবিতায়ও চকিতে দেখা দেয় বিপরীতের সংশ্লেষ : 'এক রাত্রিতে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি ঘা ও গহ্বরে ভরা ছায়াপথের গলিতে/ আরেক রাত্রিতে খুলি তপোবনের স্বর্ণদুয়ার, নরকের বীভৎস দরোজা/এক হাত প্রস্ফুটিত ক্ষতে চাপ দেয়, আরেক হাতে মহান গ্রন্থ খোলা/গ্রন্থকে জীবন্ত মনে হয় আজ, প্রতিটি বেশ্যাই এই শহরের শেষতম/শহীদ'।

একটি 'সাহিত্যপত্র'-এ নানা প্রশ্নের উত্তরে মণিভূষণ ভট্টাচার্য জানিয়ে ছিলেন : '…আমি বক্তব্য বিষয়কে সোজা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।……

……কবিতাকে ব্যক্তিগত জটিলতা ত্যাগ করে জনপ্লাবনে স্নান করে শুদ্ধ হতে হবে। কবিতার কাজ শুধু ব্যাখ্যা করা নয়। কবিতাকে পাল্টানো, সমাজকে পাল্টানোর দায়িত্ব কবিকে গ্রহণ করতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নকে পাঠকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে পাঠকের সঙ্গে কবিকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে।

সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক যন্ত্রণাময় জীবন ও সংগ্রামের উপাদানেই আমার কবিতার তত্ত্ববিশ্ব রচিত হয়েছে। কবিতা মানেই সশব্দ সংগ্রাম। আমি একজন শব্দসন্ধানী মজুর মাত্র।' (এবং এই সময়/সাহিত্য ত্রৈমাসিক/ ৫ম বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, '৮৮, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৫। সম্পাদক : অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ফলতঃ মণিভূষণ সর্বতোভাবে দায়বদ্ধ কবি। তাঁর দায় স্বসময়, স্বদেশ, স্বসমাজের প্রতি, আর্ত, উৎপীড়িত মানুষের প্রতি। সমীপ সময় ও অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর কবিতার বিষয় বা ভাববস্তুতে সর্বগ্রাসী প্রাধান্য বিস্তার ক'রে চলে। অত্যাচারী, ক্ষমতালোভী শোষক ও ভণ্ড আখের-গুছোনো রাজনীতিকের প্রতি তাঁর বিরূপতা পবিত্র রোষ, ঘৃণা ও ধিক্কারে যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি বুভুক্ষু, আতুর, রিক্ত মানুষের

প্রতি, মানুষের রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া সত্তরের মরীয়া কৈশোর ও যৌবনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাপূত গভীর মমত্ববোধ ও আন্তরিক সমর্থন দ্ব্যর্থহীন আবেগে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। 'গান্ধীনগরে রাত্রি' কাব্যগ্রন্থের 'ক্ষমাপ্রার্থনা' কবিতায় হাল্কা চালে কবুল করেন মণিভূষণ: 'কী হবে আর পাতা উল্টে শঙ্খ ঘোষ বা হার্ট ক্রেমের / ভারতবর্ষ রেসের মাঠ মুৎসুদ্দি-বেনের, / খবর হতে পারি নি, তাই / অভিমানে আঙুল ফোলাই, / এখন শুধু গদ্য পড়ি, ফ্রন্টিয়ারে, / সমর সেনের।' সমর সেনের কবিতা ক্রমশই গদ্যাত্মক, বক্তব্যভারাক্রান্ত, বিবৃতিসর্বস্ব হতে হতে এক নীরব শূন্যতায় লীন হয়ে যায়, তারপর স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয় 'নাউ' এবং 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সংগ্রামী সাংবাদিক গদ্যের পর্যায়। মণিভূষণ কিন্তু ক্রমশই তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তাকে আবহমান কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চান; প্রকট বক্তব্যের ঋজু উপস্থাপনের ফাঁকে ফাঁকেই উঠে আসে এমন আশ্চর্য দ্যোতনাচ্ছুরিত উচ্চারণ যা আমাদের অস্তিত্বের গহনে তুমুল আলোড়ন ঘটিয়ে ভাঙচুর করতে থাকে, অন্তর্গত রক্তক্ষরণে আমরা বিহ্বল হয়ে উঠি। মণিভূষণের দায়বদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'উৎকণ্ঠ শর্বরী' থেকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর'-এ পদ্যছন্দের আঁটো রূপবন্ধ ও সংহত বাচনকে রপ্ত ক'রে নিতে চান মণিভূষণ যাতে পরবর্তী বক্তব্যসচেতন গদ্যপদ্যের খোলামেলা রূপবিন্যাস সহজ স্বচ্ছন্দ হয়, পোক্ত হয় দীর্ঘ কবিতায় বিস্তারিত পঙ্ক্তি বিন্যাসের সামর্থ্যের ভিত। এর মধ্যে 'কোন জীবিত কবির প্রতি'-র তীক্ষ্ম তির্যক ব্যঙ্গ এবং 'দ্বৈতভাষণ'-এর 'নির্ভেজাল ভদ্রলোক'-এর প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপে তথা নির্মোহ আত্ম-সমালোচনায় পরিণত মণিভূষণের স্বরভঙ্গির অংশতঃ আভাস মেলে। প্রথম থেকেই ধ্বনিসম্মোহময় গীতল উচ্চারণ মণিভূষণের সহজ আয়ত্তে ছিল। অগ্রন্থিত 'তাম্বূল তর্পণ'-এর লঘু-চঞ্চল উচ্ছলতার স্রোতেই ভেসে আসে এমন ধ্বনি-তরঙ্গিত সুরময়তা: 'পেরিয়ে এলাম বনঝাউয়ের আবোলতাবোল বাতাস-ঘেরা সমুদ্রতীর, / পেরিয়ে এলাম ইতস্তত গুলির শব্দে উল্টে-পড়া ঘরে-ফেরার বিকেলগুলি, / পেরিয়ে এলাম নিরন্ন রাত উল্কা-ঝরা, বটের পাতায় অল্প হাওয়ার / বিদায় বাসর,'। 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'-তে 'রাজহাঁস' শীর্ষক যে একুশটি সনেট পরম্পরা মণি-

ভূষণ সাজিয়ে দেন তাতে তীব্র সংরক্ত প্রেমের প্রতীকায়িত অভিব্যক্তি ঘটে। 'কাটা তরমুজের কাহিনী' কবিতায়, ঈষৎ লঘু মেজাজে, ছন্দের ওপর অনায়াস নিয়ন্ত্রণে, সহজ সাবলীলতায়, মণিভূষণ স্মৃতিচারণার বিষাদঘেরা সুখস্বাদকে ধরে দিতে পারেন, কিন্তু কবিতার একেবারে শেষ পঙ্ক্তিতে 'ঘুমের মধ্যে দু'খান হ'য়ে ঘুমের ভিতর ঘুমিয়ে পড়ি'-তে 'ঘুম' শব্দের পুনরাবৃত্তিজনিত লিরিকাল আবেশের মধ্যে 'দু'খান হ'য়ে'তে সত্তার অন্তর্দীর্ণতা কি একটু আভাসিত হয়ে ওঠে না? 'মধ্যবর্তী নির্বাচন' কবিতার শেষ স্তবকে ভোজ্যের পরিমাণ-প্রাচুর্যের বৈপরীত্যে অন্নহীনতার রিক্ততা ফোটে লিরিকাল ধ্বনিময়তায়, নিসর্গের মায়াবী চিত্রময়তার সঙ্গে: 'অবলম্বনে শিশুরা জুড়েছে খেলা / মাংসের ঝোলে ডুবে গেল সারাবেলা, / জামের পাতায় সোনালি জালের প্রান্ত গুটিয়ে / পতিত রাত্রি আসে, / নিরন্ন সেই নির্জন শিশুগুলি / ঘুমায় পথের পাশে।' মোহসঞ্চারী নৈসর্গিক চিত্রকল্পটির মধ্যকার 'পতিত'—রাত্রির এই বিশেষণটি হঠাৎ আমাদের চেতনায় ধাক্কা দিয়ে নিসর্গ থেকে মানব সমাজের দিকে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তার পরেই, তার সঙ্গে পরের পঙ্ক্তির 'নিরন্ন' ও 'নির্জন' শব্দদুটি জুড়ে গিয়ে অবহেলিত শিশুদের নিঃসঙ্গ ক্ষুধাতুর সত্তাকে উন্মোচন ক'রে দেয়। 'সেদিন ছুটি ছিল' কবিতায় আবেশময় নিসর্গ মাধুরীর মধ্যেই ঢুকে পড়ে রক্তাক্ত প্রতিরোধ ও সংগ্রামে উত্তাল, উপদ্রুত সমকাল ভয়ঙ্কর কিছু অনুপুঙ্খ নিয়ে। 'দেওয়াললিপি' কবিতায় আভাসিত হয় সমকালীন রাজনৈতিক আলোড়ন, সত্তরের মরীয়া কৈশোর ও যৌবনের মরণপণ সংগ্রাম। 'সাহিত্য একাডেমিকে খোলা চিঠি' কবিতার উপান্ত্য স্তবকে কবি আবহসৃষ্টির নৈপুণ্যে একটি বজ্রগর্ভ পরিস্থিতিকে ঘনিয়ে তুলতে পেরেছেন। 'দিনলিপি' কবিতায় উঠে এসেছে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ছবি—নৃশংস হত্যা, দেশে দেশে দৃঢ়সংকল্প প্রতিরোধ ও সংগ্রাম। 'সংসদীয় গণতন্ত্র' ও 'এই বইয়ের কম্পোজিটারকে' কবিতা দুটিতেও চলে আসে কবির রাজনৈতিক বক্তব্য। 'গান্ধীনগরের রাত্রি' কাব্যগ্রন্থের 'পুষ্প প্রদর্শনী' কবিতায় গদ্য ও পদ্যের যুগপৎ ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট তাৎপর্যময়তায় প্রত্যক্ষ ও প্রকট হয়ে ওঠে আমাদের নাগরিক পরিমণ্ডলের তীব্র স্বতোবৈপরীত্য। 'আসামী পক্ষের সওয়াল' কবিতায় একই সঙ্গে আসামী ও বিচারকের ভূমিকা গ্রহণে দীর্ণ ব্যক্তিত্ব বা

সুস্পষ্ট পার্সোনালিটি প্রতিপাদিত হয় এবং আত্মসমালোচনার সততাও ফুটে ওঠে। 'ক্ষমা প্রার্থনা' কবিতার হাল্‌কা মেজাজ ও ক্ষিপ্র চলনের মধ্যেই ঢুকে পড়ে সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির কঠিন-হিম বাস্তবতা '...এখন শুধু মনে পড়ে / হাজার হাজার ছেলের লাশ ঠাণ্ডা ঘরে।' 'সুচরিতাসু' কবিতায় নারীর সাজ-পোশাক ও প্রসাধনের প্রসঙ্গ আসে প্রতিরোধ, সংগ্রাম ও দমনের সমকালীন রক্তাক্ত বাস্তবতার বিশদতর চিত্রকে পাশাপাশি নিয়ে। 'নীলাচল নিবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি'-তে পৌরাণিক উল্লেখের রূপকাশ্রয়িতায় বৈপ্লবিক আলোড়ন ও সফলতার রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আসে শিল্পিত অভিব্যক্তির শর্তকে বজায় রেখেই। 'ডানকানের মৃত্যু' কবিতায় ভয়ঙ্কর জাগরণের ভবিষ্য-চিত্র মন্ত্র-গম্ভীর উচ্চারণে রূপ গ্রহণ করে। 'ভোরের আগে' কবিতায় 'হাঁড়ির তলায় টগবগ করে ফুটছে / চালের খুদ' হতশ্রী সর্বব্যাপ্ততার নিরীহ বাস্তব এই অনুপুঙ্খটি শেষে উপমান হয়ে চেহারাটাই পাল্‌টে নিয়ে ক্রোধে, প্রতিবাদে, উত্তেজনায় ফুঁসতে থাকা সমসময়ের প্রতিমাটি ফুটিয়ে তোলে।' 'শ্রীপঞ্চমী' কবিতায় দেবী সরস্বতীর নগ্নিকা ভয়ঙ্করী কালীমূর্তিতে রূপান্তরের বর্ণনা শিল্প ও সংগ্রামের অনিবার্য সংযোগটি সূচিত ক'রে এক ভয়াল সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয় ও এক বিরল সাবলিমিটিকে প্রকাশ করে। 'প্রিয়তমাসু' কবিতাটিতে প্রেমের আবেশ ও সমকালের কঠোর সংকল্প-উদ্দীপ্ত রক্তাক্ত সংগ্রামের রাজনৈতিক বাস্তবতা একই লিরিকাল আবেগে অনেকটা গাঁথা হয়ে যেতে পারে। 'মানুষের অধিকার' কবিতা-পুস্তিকায় প্রথমে অন্তর্ভুক্ত, পরে 'দক্ষিণ সমুদ্রের গান'-এ পুনর্মুদ্রিত 'সুকান্ত ভট্টাচার্য'-কে খোলা চিঠি' কবিতাটি সুস্পষ্ট বক্তব্যপ্রবণ হলেও প্রাণময় হয়ে ওঠে আবেগ, ক্ষোভ, ক্রোধের আন্তরিক অভিব্যক্তিতে। এই কবিতার উপমা ও চিত্রকল্প বাস্তব পারিপার্শ্বিকতার সন্ত্রাস, বিপন্নতা, অবক্ষয় ও উদ্দীপনাকে আত্মস্থ করে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত হয়ে ওঠে। 'দক্ষিণ সমুদ্রের গান' কাব্যগ্রন্থের 'বাবা', 'দধীচি', 'সেই মুখ' কবিতা তিনটিতে কাহিনীর সেই সুস্পষ্ট আদল পাই যা 'গান্ধীনগরে রাত্রি' থেকেই মণিভূষণের কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, ১৯৭৯'-তে মণিভূষণ শিশুবর্ষ উদ্‌যাপনের সব ধুমধামের অন্তর্নিহিত অসারতা ও ভণ্ডামীকে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণে নগ্ন করতে চেয়েছেন।

এই কবিতায়, 'ছেঁড়া মা এবং খোঁড়া শিশুর মাঝখানে স্তনাহীন অনন্ত শূন্যতা।'—এইরকম এক-একটা পঙ্‌ক্তি একেবারে আমাদের চামড়ার ভেতরে সেঁধিয়ে যায়। 'গার্হস্থ্যের গান' কবিতায় চারপাশের ক্ষুধাদীর্ণ অস্তিত্বের হাহাকার, জীবন সংগ্রামের কঠোরতায়, স্বপ্নময় উদাস কৈশোরের অধোগতি তথা বিনষ্টির সংবেদী অনুধাবন, গার্হস্থ্য পরিবেশের সংকীর্ণ গণ্ডী ও তুচ্ছ প্রাত্যহিকতায় নাক্ষত্রিক ব্যাপ্তি সঞ্চার ক'রে দেয়, ধ্বনিত ক'রে তোলে উজ্জ্বল মহাসমুদ্রের গান। 'দক্ষিণ সমুদ্রের গান' নাম-কবিতাটিতে, অতি-দীর্ঘায়িত বিস্তারে, তীব্র সামাজিক-রাজনৈতিক বক্তব্যের উচ্চারণকে গভীর সংবেদনা, আন্তরিক উপলব্ধি ও নিশ্চিত উপস্থাপন-নৈপুণ্যে মণিভূষণ, ছিলাটান আততিতে ধরে রেখে দেন। আর 'দক্ষিণ সমুদ্রের গান' কাব্যগ্রন্থেরই 'সন্ধিক্ষণ' ও 'ফেরা'—এই দুটি কবিতায় তিনি এক বিরল শিল্পসিদ্ধির পরিচয় মুদ্রিত করেন। একই বিন্দুতে তিনি মিলিয়ে দেন তন্‌গত নিসর্গ-সন্দর্শন, আত্মগত বিষাদ ও উল্লাসের মগ্ন ও উচ্ছল অনুভূতি এবং সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার নিজস্ব অনুধাবন ও প্রতিক্রিয়ার তীব্রতাকে। শান্ত স্তব্ধ নিসর্গের পটে ও প্রতিমায় তুলে আনেন তিনি বলদর্পী ঘাতকের জিঘাংসা আর বিদ্রোহী যৌবনের মরীয়া সংগ্রামকে। 'সন্ধিক্ষণ' কবিতায় নিসর্গ-আশ্রয়ী লিরিকাল অন্তর্মুখিতা এবং চারপাশের সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক পরিমণ্ডলের বহির্মুখী অনুধাবন আশ্চর্য একাত্মতায় বাঁধা পড়ে। নিসর্গের ওপর স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গতিবোধে কবি আরোপ করেন সমকালীন রক্তাক্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া নিঃশঙ্ক যৌবনের অদম্য প্রতিরোধকে: 'সারা সন্ধে সিগারেটে ছ্যাঁকা খেয়ে-খেয়ে / গ্লানিহীন স্বীকারোক্তিহীন / ঝাউবনে রাজবন্দী চাঁদ,।' এই কবিতার চারটি স্তবকেরই শেষ পঙ্‌ক্তিতে ধুয়োর মত আবৃত হয়: 'হাওয়া আসে বারোটা নাগাদ।' —যা অভাব ও নিপীড়নের মধ্যে নবজীবনের খোলা হাওয়া বইয়ে শেষে মুক্তি ও উত্তরণের দূর-সংকেত ও ব্যাপ্তিকে আভাসিত ক'রে দেয়। 'ফেরা' কবিতায় আবেগ-তরঙ্গিত দীর্ঘায়িত গদ্যে মণিভূষণ অব্যাহত বাস্তব প্রতিবেশকে তীব্রভাবে স্বীকার করে নিয়েই, প্রেমের আবেশকে আশ্চর্য রহস্যমধুরতায় ঘনিয়ে তুলতে পেরেছেন। পারিপার্শ্বিক নিসর্গের অপ্রতিরোধ্য সৌন্দর্য, আর তারই পটে নারীর দেহলাবণ্যের মায়া, তার আচরণের মোহময় অনুপুঙ্খ, চারপাশের জন-

জীবনের প্রবাহ ও স্পন্দন, প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামের তীব্রতা ও গ্লানি, অব্যবহিত পরিবেশের ক্লিন্ন কোলাহল ও ব্যাধিত কুশ্রীতা এবং সর্বোপরি দুর্ভিক্ষ এখানে অবাক্-করা সঙ্গতি-সুষমায় গাঁথা হয়ে গেছে। কবিতাটি শেষে গ্রামীণ ভারতবর্ষের ক্ষুধাতুর বাস্তবতাকে চকিতে ছুঁয়ে, নবীন নাগরিক জীবনের বিশালতায় উত্তরণের স্বপ্নময় হাতছানি দিয়ে যায়।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁর কবিতায় স্বসময়, স্বসমাজ ও স্বদেশ-সম্পর্কিত বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন, তবে তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তাঁর আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিসত্তার আর্তি, অস্তিত্বের সংকট। 'দর্পণে অনেক মুখ' কাব্যগ্রন্থে আঁটো গঠন ও স্পষ্ট বিবৃতিধর্মী উপস্থাপন-ভঙ্গি লক্ষণীয়। 'শবযাত্রা' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায় বেহুলা-লখিন্দরের মিথ ভেঙেচুরে যে চেতনা-প্রবাহ-সঞ্জাত রচনার প্রয়াস পেয়েছেন কবি তাতে বুদ্ধদেব বসু-কৃত শার্ল বোদলেবের কবিতা-অনুবাদের বেশ ছায়া অনুভূত হয়। 'হেমন্তের সনেট'-এ বেশ গুরুগম্ভীর বক্তব্য সোজার স্পষ্টতায় উপস্থিত করতে চেয়েছেন কবি। 'যে কোন শিল্পই হবে রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ'—এ যেন ঘোষণার মতো লাগে। 'আগুনের-বাসিন্দা'য় আবেগ জড়িত গদ্য উচ্চারণে, উপমাপুঞ্জের মধ্য দিয়ে কবি নিজের বক্তব্যকে অভিব্যক্তি দিতে চান। তাঁর উচ্চারণে রেটোরিকের প্রাধান্য লক্ষণীয়ভাবেই চোখে পড়ে। আর 'কোন সুন্দরী মহিলাকে'-র মতো কবিতায় বুদ্ধদেব বসু-কৃত বোদলেবের কবিতা-অনুবাদের ছায়া থেকেই যায়। 'যাত্রা' কবিতায় পাই খ্রীষ্টীয় পুরাণ বা বাইবেল-বাহিনী, ভারতীয় পুরাণ, মধ্যযুগের বাংলা মহাকাব্যের উল্লেখ। তবে এখানে রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' ও রবীন্দ্রনাথ-কৃত এলিঅটের 'জার্নি অব্ দি মেজাই'-এর অনুবাদ 'তীর্থ-যাত্রী'-র ছায়া একেবারে দুর্লক্ষ্য থাকে না। 'ইব্লিসের আত্মদর্শন'-এর 'রক্তস্নাত বিষাদলীন অনুভূতিমালা' কিছুটা চেষ্টাকৃত উচ্চারণে ক্লিষ্ট ও চীৎকৃত মনে হয়। 'অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত' কাব্যগ্রন্থে চেতনা-প্রবাহ-সঞ্জাত আত্মকথন ইচ্ছাকৃতভাবে একটু আলগা, ছড়ানো, কখনও পুনরাবৃত্তি-মন্থর উপস্থাপনভঙ্গিতে স্বাভাবিকতা পায়। 'জন্মদিনে/ডিসেম্বর'৬১'-এ বেশ খোলামেলা ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে আশাভঙ্গ, শূন্যতাবোধ, আয়ুক্ষয়, আসন্ন মৃত্যুর করাল ভ্রূকুটিকে কবি যে প্রকাশ করেন, তা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। 'হিমজড়ানো দীর্ঘ সেতু' কবিতায়ও চেতনাপ্রবাহজাত উচ্চারণ

স্বতোৎসারিত, অকৃত্রিম মনে হয়। 'বিষমুক্তির শ্বেতরক্ত'-এর 'মানবপুত্রের আত্মচিন্তা'-র মতো রচনায় কবি টানা গদ্যের ছাঁদ গ্রহণ ক'রে, 'স্পেস'-এর 'তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহারে, বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্য আনেন। 'শোণিতগন্ধী বর্ণ-মালা'-য় কবির মগ্নচৈতন্যের গহন-অন্ধকার থেকে উঠে আসা টুকরো টুকরো ছবি নস্টালজিয়ায় মেদুর হয়ে ওঠে।

বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়াস দেখা যায় শান্তনু দাসের কবিতায়ও। তবে বিষয়ানুগ ভাষা ব্যবহারের সচেতন প্রয়াসে তাঁর শব্দপ্রয়োগ ও উপমা/চিত্রকল্প জোর-করা চমকে ও কষ্টকল্পনায় ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। 'কাফের' কাব্যগ্রন্থ থেকে কবির লক্ষ্যভ্রষ্টতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত চয়ন করা যায়: 'ভিজে উনুনের মতো চাঁদ ছিলো ভূপালী-আকাশে।' (কাফের), 'আমাদের দু-মুঠি মাথা রক্ত-ছিলা, সময়ের রৌদ্র-আলোয়ান' (ঐ), 'আমার কি বাউল হওয়া সাজে এই বেবুশো-চরণে?' (ঐ) 'ছাড়ানো আমের মতো সূর্য নাচে/ভোরে—/তোমাদের প্রার্থনার ডালিম-আকাশে॥' (ঐ), 'এখন আমি মধ্যদিনের সূর্য পিষি ঘাসে,/ জন্তু হয়ে সময় ঘোরে বিচিত্র ক্যানভাসে', (তুমি আমায় বলেছিলে)। রবীন সুরও তাঁর কবিতায় স্বদেশ, স্বসমাজ সম্বন্ধে অবধানতার পরিচয় দেন। চারপাশের উপদ্রুত পরিবেশকে কখনও তিনি বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে ধরতে চান, কখনও তাঁর প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করেন। কখনও তাঁর সচেতন অভিপ্রায়, প্রকট উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর আভ্যন্তর কবিস্বভাব, সহজাত মানসতার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। ফলে তাঁর লেখায় চলে আসে নিছক বর্ণনা, নিষ্প্রাণ বিবৃতি, কিছু বাঁধাধরা শব্দের ক্রমাগত ব্যবহারে, বাঁধাধরা শব্দের ক্রমাগত ব্যবহারে ক্লিশেদুষ্ট উচ্চারণ। যেখানে তিনি বক্তব্য উপস্থাপনের যান্ত্রিক প্রকাশ থেকে বিরত হয়ে আপন স্বভাবকে মুক্তি দেন সেখানেই তাঁর কবিতা আমাদের ভেতরকে ছোঁয়। 'মৃত্যু' কবিতায় অতি সংক্ষিপ্ত আয়তনে, নিরাবেগ, নির্লিপ্ত ভঙ্গির আশ্রয়ে তাঁর উচ্চারণ আমাদের চেতনাকে বিদ্ধ করে। 'চিত্তরঞ্জন ১৯৭৭' এবং 'ফতেপুর স্টেশনে সূর্যাস্ত' কবিতাদুটিতে পথচলতি অভিজ্ঞতা, স্মৃতির উত্তাপ, নিসর্গদর্শন—এসব শান্ত, মৃদু, মগ্ন অনুভূতির মধ্য দিয়ে স্মরণীয় হয়ে ওঠে। 'বারো নম্বর বাড়ি' এবং 'শীতবসন্তের কবিতা' স্মৃতির উত্তাপে কবির বর্ণনা আশ্চর্য হার্দ, সজীব হয়ে ওঠে। সামসুল হক তাঁর কবিতার আপাত সহজ ভঙ্গিতে ক্রমশই অব্যবহিত দেশকাল ও আবহমান

জীবন সম্পর্কে গূঢ়গম্ভীর বক্তব্যকে উপস্থাপনের প্রয়াস করেছেন। 'শহর ভেঙে যায় তবুও থেকে যায় কোথাও শহরের দুর্গ/দুর্গ ভেঙে যায় তবুও থেকে যায় কোথাও দুর্গের পায়রা' (২৩, পাপপুণ্য), 'বনের বাইরে থেকে চাঁদ/বাঘেদের ছোট্ট জলাশয়ের টানেই/আকাশকে ফেলে রেখে একা বনে ঢোকে/এ-রকমই মানুষের রীতি' (৪৩, ঐ), 'যতোদূর মাংস আছে ততোদূর উদ্ভিদের পথ' (৪৬, ঐ), 'ওকে একটা বাঁশি কিনে দাও/ও আজ প্রথম শবযাত্রা দেখেছে' (৫৯, ঐ), 'প্রত্যেক পুতুলকে/, একটা ক'রে মানবশিশু উপহার দাও' (৬৫, ঐ) 'জেগে উঠছে বিধ্বংসী শিশুরা হাসি জ্যামিতিক খিলানে', (৭২, ঐ), 'জ্যোৎস্নায় দীঘির জলে কাপড় শুকোয় ভিখিরিরা/ওরাই শিল্পের খোঁজ রাখে করে শিল্পানুগ ক্রীড়া' (শিল্পানুগ ক্রীড়া, সোনার ত্রিশূল), 'অরণ্যে ফোটানো জ্যোৎস্না বলো কার বিরোধিতা আছে/পাতালে ওড়াবো পাখি বলো কার বিরোধিতা আছে' (প্রতিবাদ, ঐ), 'ঘরে-ফেরা প্রবাসীরও হয়ে যায় ভুল/আর ক্ষুধা শত্রুর ব্যূহের দিকে ছুঁড়ে দ্যায় সোনার ত্রিশূল' (বারবার ভুল, ঐ)—এই ধরনের গূঢ় কথনও বা আপাত বিপরীত বর্ণনায়, বিবৃতিতে সামসুল তাঁর অনুধাবন ও বক্তব্যকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। সহজ একমাত্রিক, প্রকট বিবৃতি কখনই তাঁর আশ্রয় হয়ে ওঠে না। ভারতীয় পুরাণ ও মধ্য-যুগীয় বাংলা লোককাব্য থেকে তিনি প্রায়শই আহরণ করেন তাঁর প্রতীক ও প্রতিমা।

এই ধরনের বক্তব্যপ্রবণ কাব্যরূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মগ্ন আত্মমুখী কাব্যরূপের সাক্ষাৎ পাই ভাস্কর চক্রবর্তী ও কালীকৃষ্ণ গুহর কবিতায়। ভাস্করের প্রথম কবিতার বই 'শীতকাল কবে আসবে, সুপর্ণা'-য় হয়তো বা উঁকি দেয় 'কৃত্তিবাস'-কবিগোষ্ঠীর কারও কারও কবিতার বিম্বিত ছন্নছাড়া, বাউন্ডুলে মানসতা, জীবনযাপন। এই বইয়ের কবিতা-গুলিতে খোলামেলা মেজাজে, ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে, আটপৌরে গদ্যে, ভাস্কর চারপাশের ঘটনা, মানুষ, বস্তু আর তাদের জড়িয়ে নিজের একান্ত ভাবনা, স্বপ্নকল্পনা, দুরন্ত মন-কেমন-করা, বিপন্ন বেঁচে থাকাকে ধরে নিতে চান। 'আমাদের স্বর্গ নেই, স্যারিডন আছে' (চৌ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা চারজন) —এমন উচ্চারণে চমকটাই হয়তো বেশি। কিন্তু সহজ, আলগা, স্বতোৎসার দৈনন্দিনতার বর্ণনা ও বিবরণ আসতে আসতে—

'নরম মাটির গন্ধে, এরোপ্লেন, নিঃশব্দে নেমে আসছে নিচুতে/দরজা খোল মা, আমি ফিরে এসেছি আবার তোমার সেই পুরনো ছেলে' (দরজা খোল মা), 'শীতকাল কবে আসবে, সুপর্ণা আমি তিনমাস ঘুমিয়ে থাকবো —প্রতি সন্ধ্যায়/কে যেন ইয়াঁকি ক'রে, ব্যাঙের রক্ত/চুঁকিয়ে দেয় আমার শরীরে—আমি চুপ ক'রে বসে থাকি—অন্ধকারে' (শীতকাল কবে আসবে, সুপর্ণা), 'বাইরে, উঁচু-নিচু জ্যোৎস্না/আমাদের স্বপ্নের রেলগাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে আজ আমাদের উঠোনে—' (চলো), '…—আমি দেখি/ একটা দিন, আরেকটা দিনের মতো/আরেকটা দিন আরেকটা দিনের মতো/ একইরকম, অস্থিসার, ফাঁকা' (কেন?), 'জানি না আমি, কোন্ শুভ্র হাত থেকে/ঝরে পড়ে ভালোবাসার সবুজ তৃণ—কোন্ অলৌকিক আলোয়, কুষ্ঠ রোগী/মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে' (হায়, জীবন)—এইরকম মোক্ষম সব উচ্চারণে কখনও শূন্যতার হাঁ-মুখ খুলে গিয়ে বুকের ভেতরটা অসম্ভব ফাঁকা লাগতে থাকে, কখনও তীব্র অনুভবে একটা ছুরির ছুঁচলো ফলা হঠাৎ বুকের মধ্যে ঢুকে যায়। এই বইয়ের একটি বিশেষ উল্লেখ্য কবিতা 'মোষ'। '—তোমারই শিংয়ের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে থাকি—কখন যে চাঁদ/ওঠে, কখন যে মেঘ/ঢেকে দিয়ে চলে যায় তোমাকে আমাকে—' এক সাংঘাতিক টেন্‌শন্ চাপা থাকে এখানে, যে টেন্‌শন মধ্যবিত্ত ক্লীব অস্তিত্বের মধ্যে, ঠাণ্ডা জমাট রক্তে, চারপাশের হিম-কঠিন প্রতিবেশ পরিস্থিতিকে ফালাফালা ক'রে চিরে দেওয়ার ভয়ংকর বাসনাকে ঘিরে টানটান হয়ে থাকে। 'এসো, সুসংবাদ এসো' কাব্যগ্রন্থে ভাস্করের উচ্চারণ আগের বইয়ের আলগা, ছড়ানো-ছিটোনো বাচনকে সংহত, একাগ্রতায় বেঁধে নেয়। একই ভাবের একটানা প্রবাহ একটা গীতল সান্দ্রতাকে জমাট করে তোলে। 'দিনরাত্রির আলোয়' শীর্ষক প্রথমাংশে টানা গদ্যে আধারিত হয় অন্তরঙ্গ গভীর আত্মকথন। বারবার 'ট্যাবলেট'-এর কথা আসে, তার সঙ্গে, ঘুম, স্বপ্ন—ভেতরে কাঁচের বাসন ভেঙে ভেঙে যায়, রক্ত চুঁইয়ে পড়তে থাকে। 'এই যে রাত, এই যে লম্বা, আকাশ-ছোঁয়া, মস্থর রাত শুধু ডানা ঝাড়ে আর ডানা ঝাড়ে— আর ছুঁড়ে দ্যায় নৈঃশব্দ্য, অন্ধকার, আর ধারালো ছুরি-ছোরা' (দু'চার লাইন), 'আমার দুঃখ এই, আমার স্বপ্নগুলো আমি স্পর্শ করতে পারি না হাত দিয়ে।' (ছায়াপথ), 'যে যেরকম পৃথিবীতে—সে, সেইরকমই

থেকে যায়। পাখির ডিমের মতো খ্যাতিহীন দূরের ছোট্ট শহর, পাখির ডিমের মতোই প'ড়ে আছে—কলকাতার অলি-গলিতে আবার দূষিত এক জীবন বয়ে বেড়াচ্ছি আমি।' (কলকাতায় আবার), '—তোমাদের জানালায়-জানালায় যেদিন বাতাস এসে উড়িয়ে দেবে রঙিন পর্দা, তোমাদের অফিসঘরের ঘন অন্ধকারময় আসবাবপত্র থেকে যেদিন রাশি-রাশি জেগে উঠবে স্বপ্ন, জেনো, আমি ছিলাম ঐসবের মধ্যেও— শুকনো একটা স্তব্ধতার মতো—বিবর্ণ একা···।' (হারিয়ে-যাওয়ার গল্প) —এইভাবে ভাস্কর প্রকাশ করেন তাঁর ভয়, দুঃস্বপ্ন, দুর্ভাবনা, বিফলতা, বেদনা, স্তব্ধতা, একাকিত্ব, অচরিতার্থ স্বপ্ন, উজ্জ্বল আশা ও আকাঙ্ক্ষা। পদ্যছন্দে দোলায়িত 'এসো, সুসংবাদ এসো' অংশে 'রক্ত' শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয় অন্তর্গত রক্তক্ষরণকে চিহ্নিত ক'রে। 'রক্ত', 'বিদায়কালীন', 'চিন্তা-ভাবনা', 'আঁধার বিষয়ে' (ঘড়ির ভেতর দিয়ে/রক্তের রেখার মতো/সময় চলেছে।), 'একা-একা' (সমস্ত সম্পর্ক আজ/ভেঙেছুরে গ্যাছে/মনে হয়।), 'এসো, সুসংবাদ এসো' (দিনগুলো, কেমন চাকার মতো,/অযথা আমাকে/পিষে যায়···।) —এইসব কবিতায় কবির বিষাদ, সন্তাপ, নৈরাশ্য, বিচ্ছিন্নতা, পীড়ন, প্রত্যাশা অনুরণিত হতে থাকে। 'মানুষের দেশে' অংশের 'শীত '৭২' (ঘুম থেকে উঠে রোজ চেয়ে দেখি/কিছু নেই···বিপুল কাঠের কান্না জেগে থাকে নক্ষত্র অবধি।), 'ক্লান্তি', 'মৃত্যু সম্পর্কে আরেকটি', 'বত্রিশ বছরে', 'টেবিল ল্যাম্পকে' (শুধু এক, বিশাল হাঁ-করা ভয়,/আমাকে গিলতে আসে প্রতিদিন।), 'বিক্ষোভ' ('বাড়ি নেই, ভোরবেলা/তবু কেন বাড়ি ফিরে আসা?', রেস্তোরাঁয় ('রক্তে বিষ মিশে আছে, প্রিয়তমা/এখন সময় যায়, আস্তে, চ'লে যায়।)—এইসব কবিতায় কবির হাহাকার, ক্লান্তি, ভয়, অনিকেত অস্তিত্ব বা নিরাশ্রয়তা, নিঃসহায়তা, জ্বালা ছন্দিত অভিব্যক্তি লাভ ক'রে আমাদের আভ্যন্তর চেতনায় হানা দেয়। 'রাস্তায় আবার' কাব্যগ্রন্থে—'আমরা ছিলাম/রুগ্ন আর স্বার্থপর।/ আমরা ছিলাম হিংস্র আর বিকল।' (এই শতাব্দীর কবিতা), 'আমি দেখেছি ডানা ভাসিয়ে এগিয়ে আসছে মরুভূমি—/···দেখি, আমার সমস্ত লেখালেখির ভেতর মৃত্যু তার ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।' (কবিতা ১৩৪), 'ঠিক একটা নরকের মধ্যে আমি বেঁচে আছি।' (নরকে), 'সাদাকালো দিনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমার রক্ত, ঘাম, ভাইসব/আমি ভুলিনি কোনোকিছুই,

আমি ভুলিনি/ঘৃণার কথা, অপমান, আর চোখের জলের কথা/ দ্যাখো— আজো রাত হলো অনেক—ঘুমোতে পারছি না আমি।' (ভাইসব), 'কেন আমার দিনগুলো/ রেল-লাইনের ধারের বাড়িগুলোর মতো নিষ্ঠুর, নিয়ন্ত্রণহীন?/ ···আমার শেষ কবিতা আমি লিখে রাখবো আমার মৃতদেহের পাশে ব'সে।' (কবিতা ১৫৩)—নঞর্থকতা, শূন্যতা, মৃত্যুর অমোঘতা, অস্তিত্বের ভয়াবহতা, পীড়ন, অপমান, বেদনাশ্রুর এইসব অভিব্যক্তির শেষে থাকে 'হে জীবন' কবিতায় আলো-অন্ধকারময় জীবনের সমগ্রতাকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রশান্ত শ্রদ্ধানম্র ঔদার্য : 'ছুঁয়ে যাই শান্ত ঘণ্টাধ্বনি/ ছুঁয়ে যাই সহস্র অসুখ।/···ছুঁয়ে যাই ব্যর্থ এ জীবন/ হে জীবন তোমাকে প্রণাম।' ভাস্করের 'আকাশ অশেষ মেঘলা থাকবে'-র ছন্দিত উচ্চারণে কবির নিঃসঙ্গতা, শূন্যতাবোধ, বিষাদ, অসহায়তা অভিব্যক্ত হলেও তারই সঙ্গে বা তাকে ছাড়িয়ে ঐ এক শান্ত স্বীকৃতিও কবিতা-গুলিকে আভা দেয়। ইঙ্গিতগর্ভ মিতভাষণে দ্যুতিময় হয়ে ওঠে ভাস্করের উচ্চারণ, যা মুদ্রিত অক্ষর ছাড়িয়ে আমাদের একেবারে ভেতরে ঘা দিতে থাকে। তাই 'এক মুখের সন্ধানে' কবিতায় যদিচ এক মুখের অসংখ্য জীবন নিয়ে খেলার রক্তাক্ত, ছিন্ন স্মৃতি লেগে থাকে, 'মুখ' কবিতায় হানা দেয় আত্মপরিচয়ের অভাবজনিত তীব্র সত্তা-সংকট (আমি কি আমার মুখ চিনেছি সঠিক?) 'এপিটাফ' কবিতায় থাকে অনিবার্য মৃত্যু-ভাবনা, 'হেমন্তভাবনা' কবিতায় কবি আমাদের জানান : 'আমি রাস্তায় বেরোই আর শুনি অবসাদ আর দুশ্চিন্তার চেঁচামেচি/ আমি রাস্তায় বেরোই আর দেখি নিঃসঙ্গতার ফাঁস', তবু 'তৃষ্ণা' কবিতায় উজ্জ্বল অস্তিত্বের অকৃত্রিম প্রত্যাশায় কবি ব্যগ্র কাতরতায় বলে ওঠেন : 'আমার আনন্দ/বলো, কবে তুমি/দীপ্তিহীন থমথমে এই দিনরাত/ধুয়ে দেবে।', 'যেরকম একদিন' কবিতায় একান্ত অনুরোধ জানান : 'শুধু, রক্তের কুপরামর্শ/ কখনো শুনো না আর। —ভালোবাসো।/ ফিরে আসে/ দিন আর রাত, ভালোবাসো।' এবং 'শতাব্দীশেষে' কবিতায় ব্যক্ত করেন এই গভীর বিশ্বাস, শান্ত প্রত্যয় : 'এখন শতাব্দীশেষে চারদিকে বিষ, তবু/ বেঁচে থাকবার মতো নির্জন সাহস দেখা দিলে/ দেখা যায় শান্ত পথ শান্ত দিন শান্ত বাড়ি শান্ত সন্ধেবেলা।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

জননী ও শিশু

তোমাকে বলেছি আমি অন্ধকারে যাবো না তবু যে-ই গেছি
আকন্দের সার দোঁখ উড়ে চলছে বকের পাঁতির মতো উঠোন ছাড়িয়ে।
আমি এখন জানিয়ে দেবো মাঝেমাঝে এইভাবে একা থাকতে হয়,
পুড়তে হয় অন্ধকারজারিত মাটিতে।
আমি কি ছিলাম বীজ, পুঁতে গেছো গর্ভের ভিতর?
নাকি কখনো কোথাও কিছু তেমন ছিলো না,
মাঝেমাঝে বৃষ্টি পড়েছিলো, আর হা হা হাওয়া গুহার আড়ালে,
তারপরে যখন এলাম আমরা, তুমি আমি, জননী ও শিশু,
তখনই কি প্রথম জন্ম নিলো এই বিশাল পৃথিবী?
তোমাকে বলেছি আমি তোমারই আঁধারে থাকবো,
আর কোনো অন্ধকারে কখনো যাবো না,
এখন দেখছি তুমি চ'লে গেছো, মৃত হয়তো, হয়তো পলাতক,
এখন আমিই আছি ছোটো ছোটো মোমের মতন
আলো-জ্বালা কীট-পতঙ্গের পাশাপাশি।

শয়তান

শয়তান তাকিয়ে থাকে, নষ্টফল গাছ থেকে ঝরে।
এই দৃষ্টি প্রথমে চিনিনি, পরে যখন চিনেছি
তখন শিউরে শিউরে উঠে স'রে স'রে গেছি এককোণে ঘরের ভিতরে।
তবু কি আগুন নেভে? দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠে একা।
দূর থেকে দেখি সব পুড়ে যায়, পুড়ে যায়, পোড়ে।
শয়তানে মানুষে কোনো সন্ধি কখনো ঘটেনি, তবু কেন
মাঝেমাঝে মনে হয় ওরা একসঙ্গে দাবা খেলতে বসে।
আমাকে দিও না দৃষ্টি, আমি বলি, আমিও মানুষ—
খেলেছি তোমার সঙ্গে, হেরে গেছি, এখন একাকী
শুধু যে নিসর্গ তুমি ছারখার ক'রে গেছো, সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

With best compliments from :

CHITRAKOOT ART GALLERY
CALCUTTA

'প্রমা'র বই

আকাশ আরো আকাশ
সুজিত সরকার
১২ টাকা
৫৭/২ ই কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩